সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা

বেলাল মাহমুদ

প্রকাশক

বেলাল মাহমুদ

পিতা: মৃত বন্দে আলী মাস্টার

মাতা: হোসনেয়ারা বেগম

গ্রাম: বেরনাইয়া, উত্তর পাড়া, বিছমিল্লাহ হাউজ, শাহরাস্তি: জেলা- চাঁদপুর।

বর্তমান ঠিকানা (লন্ডন)

Belal Mahmud

Sleigh House, Flat No.10 Bacton Street (79Roman Rd), London, E2 0PH, UK.
Email: belalmahmud 2017@gmail.com
Mobile No : 0044-7984694170, 0044-7448633629,
Land line No. 0044-020 3623 4885 (Res)

সার্বিক সহযোগিতায়

প্রিয়তমা স্ত্রী

Mrs. Naznin Akhter (Akhi), London, UK

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০১৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন- ২০১৯

তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি, ২০২২

চতুর্থ সংস্করণ: জুন-২০২৪

রিভিউয়ার ও পরিমার্জনকারী :

ডক্টর শাহ মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম

শিক্ষক, ইসলামিক স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনা :

জহিরুল হক

সাবেক অধ্যক্ষ ব্লুমফিল্ড স্কুল এন্ড কলেজ, বারিধারা, ঢাকা।

গ্রাম: বানিয়া চোঁ, পো: কালিয়াপাড়া, থানা: শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর।

ফোন:০১৮৮৩৭৩৪৬৪৪,০১৯৬৪৩২৬২৯৯, ইমেইল: zahirulhaquebd76@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান :

East London Book Shop,
117 Whitechapel Road,
London, E1 1DT, UK
Phone : 0044 020 7422 0005

মুদ্রণে :

হাদিয়া : ৩০০.০০ টাকা মাত্র।

SAHOJ PODDOTITE QURAN O ISLAM SHIKKAH
ISBN :978-984-91679-9-0

সূচিপত্র

বিষয়বিন্যাস পৃষ্ঠা

- লেখকের কথা ----------১
- ভূমিকা----------৩
- বাণী ----------৫
- উৎসর্গ----------৬

প্রথম খণ্ড

কুরআন পরিচিতি ও শিক্ষা

১. কুরআন পরিচিতি ও গ্রন্থায়নের ইতিহাস----------৭
২. কুরআন শিক্ষার সুফল, না শিক্ষার কুফল ----------৮
৩. কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ---------- ১০
* সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্বারোপ করে বর্ণিত আয়াতসমূহ---------- ১২
* সন্তানদের প্রতি লোকমানের উপদেশসমূহ ---------- ১৩
৪. তাজবিদ শিক্ষা---------- ১৪
৫. হুরূফে তাহাজ্জি বা আরবী বর্ণমালা : ২৯টি ---------- ১৫
৬. হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে: আরবী হরফ ২৯ মাখরাজ ১৭টি ---------- ১৬
৭. কতিপয় হরফের পার্থক্য ---------- ১৭
৮. হরকত, জযম, তাশদীদ---------- ১৭
* হরকত, জযম, তাশদীদ-এর ব্যবহার---------- ১৮
৯. মাদ্দ-এর বিবরণ ও প্রকারভেদ---------- ১৯
১০. মীম ছাকিনের বিবরণ---------- ২৩
১১. নূন ছাকিন ও তানভীনের বিবরণ ---------- ২৪
১২. ওয়াজিব গুন্নাহ---------- ২৬
১৩. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লাম-এর পড়ার নিয়ম---------- ২৬
১৪. ক্বলক্বলা হরফের বিবরণ ---------- ২৬
১৫. 'র'- হরফ মোটা ও চিকন করে পড়ার নিয়ম---------- ২৮
১৬. গোল-তা পড়ার বিবরণ ---------- ৩০
১৭. আলিফে যায়েদা ---------- ৩০
১৮. হামযাতুল ওয়াসল---------- ৩০
১৯. আল শব্দ পড়ার নিয়ম ---------- ৩১
২০. ওয়াক্বফ-এর বিবরণ---------- ৩২
২১. আলিফে মাকসূরা ---------- ৩৩
২২. 'আনা' শব্দ পড়ার নিয়ম ---------- ৩৩
২৩. সীফাত পড়ার নিয়মাবলী ---------- ৩৪

২৪. সীফাতে মুতাজাদ্দাহ ১০ প্রকারের ব্যাখ্যা ---------- ৩৪
* সিফাতে গায়রে মুতাজাদ্দাহ ---------- ৩৬
২৫. হরফ দিয়ে শব্দ তৈরি করার উদাহরণ ---------- ৩৭
২৬. আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে উদাহরণ/ব্যবহারিক প্রয়োগ ---------- ৩৯
২৭. অর্থসহ ১০টি সূরা : সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফিল পর্যন্ত---------- ৪০
* সূরা ফাতিহা ---------- ৪০
* সূরা নাস ---------- ৪১
* সূরা ফালাক---------- ৪১
* সূরা ইখলাছ---------- ৪২
* সূরা লাহাব---------- ৪৩
* সূরা নাস্‌র ---------- ৪৩
* সূরা কাফিরুন ---------- ৪৪
* সূরা কাওসার---------- ৪৫
* সূরা মাউন ---------- ৪৫
* সূরা কুরাইশ ---------- ৪৬
* সূরা ফীল ---------- ৪৭
২৮. আরবীতে ১২ মাসের নাম ---------- ৪৮
২৯. আরবীতে ৭ দিনের নাম---------- ৪৮
৩০. আরবীতে সংখ্যা ---------- ৪৯
৩১. কথা বলার আদব ও মাধুর্য ---------- ৫০
৩২. খাওয়ার আদব---------- ৫১
৩৩. মজলিসের আদব---------- ৫১
৩৪. মসজিদের আদব---------- ৫২
৩৫. রাস্তা বা যানবাহনে চলার আদব---------- ৫৩
৩৬. সময়ের মূল্য---------- ৫৪
৩৭. ব্যায়াম ও পানির অপরিহার্যতা ---------- ৫৫
৩৮. দারস দেওয়ার পদ্ধতি ---------- ৫৬
৩৯. খোতবা দেওয়ার পদ্ধতি---------- ৫৬
৪০. সালাম---------- ৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড

১. দাওয়াতে দ্বীনের কালিমাসমূহ---------- ৫৯
২. ঈমান কি ও তার ব্যাখ্যা ---------- ৬০
৩. ঈমান ভংগের কারণসমূহ---------- ৬২
* শয়তান ঈমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু ---------- ৬৪
৪. ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা---------- ৬৫
* হাদীস কোথায় পাওয়া যাবে?---------- ৬৭
* আল্লাহকে রব মানার অর্থ কী?---------- ৬৭

৫. দ্বীন কাকে বলে? ---------- ৬৮
৬. রাসূল মানার অর্থ কি ---------- ৬৮
৭. আখেরী বা শেষ নবী ---------- ৬৮
* মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ নবী, কুরআনের দলীল ---------- ৬৯
* মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) মহাবিশ্ব মানবতার নবী ---------- ৬৯
* মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীল মোহর ---------- ৭০
* সকল নবী বৈমাত্রেয় ভাই ---------- ৭০
৮. রিসালত ---------- ৭১
* রিসালাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ---------- ৭২
৯. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ---------- ৭৩
১০. মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলী ---------- ৭৪
১১. নেশা / সিগারেট ও মাদকদ্রব্যের অপকারিতা ---------- ৭৫
১২. আত্মহত্যা ---------- ৭৬
১৩. সুন্নাত ও বিদ'আত ---------- ৭৭
* বিদ'আত-সুন্নাতের বিপরীত ---------- ৭৭
১৪. জ্ঞান অর্জন ও তারবিয়াহ ---------- ৭৯
* জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ---------- ৭৯
* জ্ঞান অর্জন ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয় ---------- ৮১
* জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা ---------- ৮২
১৫. পবিত্রতা ---------- ৮৩
* পবিত্রতা কী? ---------- ৮৩
* অযু সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ---------- ৮৪
১৬. সালাত (নামাজ) ---------- ৮৫
* সালাতের পরিচয় ---------- ৮৫
* নামাজ সংক্রান্ত কতিপয় কুরআনের আয়াত ---------- ৮৭
১৭. নামাজের বাইরে ও ভিতরে তেরো ফরয ---------- ৮৮
১৮. সানা ---------- ৮৯
* তাশাহুদ ---------- ৯০
* দরুদ ---------- ৯০
* দোয়া মাসূরা ---------- ৯১
* দোয়া কুনুত-১ ---------- ৯১
* দোয়া কুনুত-২ ---------- ৯২
* নামাজ সম্পর্কে কিছু হাদীস ---------- ৯৩
* সন্তানদের প্রতি সালাত আদায়ের নির্দেশ ও সালাতের ফযীলত ---------- ৯৪
১৯. জুমু'আর নামাজের বিবরণ ---------- ৯৬

২০. ঈদের নামাজ---------- ৯৮
২১. জানাযার নামাজ ---------- ১০০
২২. রোযা বা সিয়াম---------- ১০১
২৩. তাকওয়া অর্জনই রোজার উদ্দেশ্য ---------- ১০২
২৪. রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের উপায়---------- ১০৩
২৫. রোজার ফযীলত ---------- ১০৫
২৬. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোজা---------- ১০৬
* একজন রোজাদারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জিহ্বা ---------- ১০৬
২৭. রমজানের বৈশিষ্ট্য---------- ১১১
২৮. রমযান মাসে কুরআন শিক্ষার ফযিলত ---------- ১১৩
২৯. এতেকাফ (রোযার শেষ দশকে) ---------- ১১৫
৩০. লাইলাতুল কদর ---------- ১১৭
৩১. যাকাত বা মাল-সম্পদ পবিত্রকরণ---------- ১১৮
৩২. হজ্জ ও উমরাহ ---------- ১২২
* একনজরে হজ্জের ৬ দিনের কার্যক্রম ---------- ১২৯
৩৩. দাওয়াহ বা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা ---------- ১৩১
৩৪. অমুসলিম দেশে দাওয়াত দানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি---------- ১৩৬
৩৫. মুসলিম ও অমুসলিম দেশে দাওয়াতের গুরুত্ব---------- ১৪০
৩৬. আদর্শ সন্তান গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা ---------- ১৪৭
* সন্তানের ১ বৎসর হতে ৭ বৎসর পর্যন্ত বাল্য প্রশিক্ষণ ---------- ১৫০
* সন্তানের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ আরম্ভ---------- ১৫১
* ছুটির দিনে সন্তানদের প্রশিক্ষণের রুটিন ---------- ১৫২
৩৭. বিবাহ ---------- ১৫৭
৩৮. পিতা-মাতার অধিকার ---------- ১৫৯
৩৯. সবর বা ধৈর্য ---------- ১৬০
৪০. তাওবা---------- ১৬২
৪১. মাসনুন দোয়াসমূহ ---------- ১৬৬
৪২. রাব্বানা দিয়ে কতিপয় দোয়া ---------- ১৬৮
৪৩. আল্লাহুম্মা দিয়ে কতিপয় দোয়া---------- ১৭১
৪৪. ফরজ নামাযে সালাম ফিরাবার পর কতিপয় দোয়া ও আযকার ---------- ১৭৪
৪৫. বাংলায় মুনাজাত---------- ১৭৭

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

পারিবারিক মাদ্রাসা ও জান্নাতি কাফেলা
মুমিনের গুণাবলী দৈনন্দিন যিকির ও দোয়া

লেখকের কথা

লাখো শুকরিয়া মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট। যিনি শত ব্যস্ততার মাঝে থেকেও Covid-19 মহামারী অবস্থায় Lockdown-এর সময় মূল্যবান সময়টুকু লেখনীর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যয় করার তৌফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য দরূদ বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মহান শিক্ষক ও বিশ্বনেতা রাসূল (সা.) ও তার বংশধরদের প্রতি। তার সাথে সালাম পেশ করছি সে সব বীর মুজাহিদদের প্রতি, যাঁরা যুগে যুগে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করতে নিজেদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বা দ্বীন ইসলাম। সে ইসলামের মূলনীতির উপর ঈমান ও বিশ্বাস এনে কাজে পরিণত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল বাকারার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন: "হে ঈমানদারগণ তোমরা পুরোপুরি ইসলামে দাখিল হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।" কুরআনের সূরা তাহরীমে আল্লাহ বলেন– "তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচ এবং তোমাদের আহালদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।" (সূরা তাহরীম-৬)

পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সন্দেহবিহীন কিতাব। এটা মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। মানবতার হেদায়াতের উৎস ও গাইড লাইন। যা সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়- অন্যায়, পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের মানদণ্ড। আর কুরআন ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের অন্য কোনো বিকল্প নেই। সম্পূর্ণ কুরআনই রাসূল (সা.) এর চরিত্র। কুরআন মানবতার ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মুক্তির বিধান বা হেদায়েতের কিতাব। কুরআন মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে আসে। যাঁরা কুরআন হাদীস অনুযায়ী দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় আমল করবে মৃত্যুর পরে তারা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। রাসূল (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।" সে জ্ঞান হতে হবে শিরক, নিফাক, কবীরাগুনাহ ও শিরক-বিদআত মুক্ত। আর তাওহীদ ইখলাস যুক্ত আমল।

কখন এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ দুনিয়া হতে যাওয়ার আগে এমন কিছু প্রস্তুতি নেয়া দরকার যাতে আখেরাতে গিয়ে অনুশোচনা করতে না হয়। আখেরাতে কেউ কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পাবে না। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে জাহান্নামের ভয়ে হৃদয় কেঁপে উঠে। তাই মৃত্যুর আগে সদকায়ে যারিয়া হিসেবে যদি কোন লেখা বই-পুস্তক রেখে যেতে পারি, তাহলে সে উছিলায় আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দেবেন বলে আশা করছি। আমার নামায, আমার রোজা, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়- তাহলে সর্বক্ষেত্রে আমরা হারাম বর্জন ও হালাল অর্জন করে তাকওয়ার জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলেই আমাদের মুক্তি হবে- ইনশাআল্লাহ।

বইটি লেখার আগে চিন্তা করেছি বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে অনেক ধর্মীয় বই-পুস্তকে গল্প কাহিনী জয়ীফ, মনগড়া হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে ভিত্তিহীন কথাবার্তা এবং একধর্মীয় নেতা আরেক ধর্মীয় নেতার বিরোধীতা ও সমালোচনার মাধ্যমে শির্ক ও বিদআতের উৎপত্তি জন্ম দেওয়া লেখার বই বাজারে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণ পাঠক এসব বই পড়ে নানা রকম বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এসব বিষয় মাথায় রেখে আমরা নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহকারে কুরআন ও বিশুদ্ধ সূত্রের সিহাহ সিত্তার নাম ও হাদীসের নাম্বার উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

মুসলমান হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত পাক কলেমার অর্থ বুঝে খাঁটি ও মজবুত ঈমান এবং উত্তম আমল নিয়ে জীবিত থাকা একটি বড় নিয়ামত। নিশ্বাস থাকা অবস্থায় জবানের মাধ্যমে সুবহানাল্লাহ, কপালের মাধ্যমে সেজদা, চোখের মাধ্যমে কুরআন পড়া, হাতের মাধ্যমে ভাল লেখা, জিহ্বার মাধ্যমে মাসনুন দোয়া, অন্তরের মাধ্যমে যিকির করা। ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত করে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মৃত্যু হয়ে গেলে সব রাস্তা বন্ধ। তাই মৃত্যুর পূর্বে (এই) সাড়ে তিন হাত শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গদ্বারা কোনটি আল্লাহর হক, কোনটি বান্দার হক, কোন কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে বাস্তবে প্রমাণ করার জন্যে কিছু দিক নির্দেশনা আমাদের এই বইতে উল্লেখ করেছি।

প্রকাশ থাকে যে, যারা বাল্য বয়সে কুরআন পড়েছেন, যাও পড়েছেন তা ছিল তাজবীদ ব্যতীত। পরিস্থিতি ও পরিবেশগত কারণে বা দুনিয়াবী ব্যস্ততায় দীর্ঘদিন কুরআন না পড়ার কারণে তা ভুলে গেছেন। আবার অনেকে ২৯টি আরবী হরফও চিনেন না। তাদের জন্য আমাদের এই বইটি সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে লাহনে জলি (বড় ভুল) যে ভুলে অর্থ বিকৃত বা পরিবর্তন হয়ে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হয়। এই বইটা বিশেষ করে পবিত্র কুরআন, নামায ও রোজার গুরুত্ব বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছি। যে কুরআন ও রোজা কঠিন হাশরে বান্দার পক্ষে বাদী হয়ে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তার সাথে ইসলামের ৫টি স্তম্ভ ও দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব সহ নামাযে পঠিত (দোয়া) বিষয়গুলো বাংলা অর্থসহ তুলে ধরেছি। অর্থাৎ একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনের যিকির, দোয়া ও মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার বইখানা কবুল করেন। আমাদের প্রকাশিত বইখানা পড়ে পাঠকবৃন্দের আমলের সামান্যতম পরিবর্তন হলেও আমাদের লেখা সার্থক হবে বলে আশা করছি। আল্লাহ আমাকেও সকল পাঠকবৃন্দকে বইয়ের লেখার আলোকে সকল বিষয়ে আমল করে জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভের তৌফিক দান করুন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

"হে আমাদের রব! আমাদের কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাত।" (সূরা বাকারা: ২:১২৭)

বি: দ্র: আমাদের বইখানায় কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল।

London

লেখক

জুন ২০২৪

Mobile No : 0044-7984694170
0044-7448633629
0044-020 3623 4885 (Res)

বেলাল মাহমুদ
Sleigh House, Flat No.10
Bacton Street (79 Roman Rd),
London, E2 0PH, UK.
Email: belalmahmud 2017@gmail.com

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা বই খানার চতুর্থ (৪র্থ) সংস্করণ সংশোধিত ও বর্ধিত কপি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মানব জাতির জীবন বিধান, হেদায়েতের উৎস, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী, আল্লাহর প্রদত্ত সন্দেহবিহীন আসমানী কিতাব হচ্ছে আলকুরআন।

প্রত্যেকটি মানুষের বাল্য জীবন হতে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় সমাধান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এ কুরআনে আল্লাহ কি বার্তা বা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তা জেনে নেওয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় কুরআনের নির্দেশ জেনে সে অনুযায়ী আমল করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা চিরসুখী স্থায়ী জান্নাত দান করবেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা আল ইমরানের ১১০নং আয়াতে বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত। মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে। আর অকল্যাণ থেকে দূরে রাখবে এবং ঈমান রাখবে শুধু আল্লাহর উপর।"

আল্লাহ আমাদের হায়াত, মউত ও বিচার দিনের মালিক। এই বাস্তবতার মুখোমুখি মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দেখানোর জন্য যে একদল মানুষের কথা আল্লাহ বলেছেন; তাদের মধ্যে নাম থাকতে হবে আপনার, আমার, আরো নাম না জানা অসংখ্য বনি আদমের। যারা হবেন যুগের রহবার রাহনুমা। তারা হবেন জমিনের লবণ, পাহাড়ের প্রদীপ, অন্ধকার রাতের দিশেহারা পথিকের জন্য আকাশের নক্ষত্র। এই দায়িত্ব পালনের জন্য কেহ মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসিহত, আলোচনা, বক্তব্য দিয়ে, কেউ কবিতা, প্রবন্ধ লিখে, বিবৃতি দিয়ে, কেহ ইসলামী বই-পুস্তক লিখে, কেউ ঈমানের দীপ্ত চেতনা দিয়ে পদচারণায় উজ্জীবিত ও মুখর রাখবেন সামাজিক অঙ্গণকে। জনাব বেলাল মুহমুদেরা সেই অগ্রপথিকদের অন্যতম। সময়ের দাবী পূরণে তাঁরা নিরলস, পিপাসার্ত পথিকের ক্ষণিকের জন্য হলেও পিপাসা নিবারণের ভূমিকা রাখবেন। তার দরদ মাখা লেখায় সামান্যতম হলেও বিদগ্ধ পাঠকের ভালো লাগবে।

যারা বাল্য কালে কুরআন পড়া শেখেছেন তাতে তাজবীদ ও শুদ্ধ ছিলনা- আবার অনেকে দীর্ঘ দিন কুরআন পড়ার চর্চা না থাকার কারণে তাও ভুলে গেছেন- তাদের জন্য- আমাদের লিখিত ৩টি বইয়ের প্রথমটিতে তাজবীদ ও ইসলামের ৫টি স্তম্ভ ও দৈনন্দিন জীবনে মুমিনের কিছু আমলের বিষয় কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের লিখিত ৩টি বইয়ের নাম:

(১) সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা।

(২) পারিবারিক মাদ্রাসার গুরুত্ব ও জান্নাতী কাফেলা

(৩) মমিনের গুণাবলী ও দৈনন্দিন যিকির ও দোয়া।

এই ৩টি বইতে আল্লাহর হক্ব ও বান্দার হক্ব উল্লেখ করা সহ শির্ক ও বিদয়াত মুক্ত ইবাদতের কিছু দিক নির্দেশনা তুলে ধারার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের বই পড়ে পাঠকবৃন্দের আমলের সামান্যতম পরিবর্তন হলে আমাদের লেখা বইগুলো স্বার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র লেখা বইগুলো কবুল করুন।

বি:দ্র: আমাদের বইগুলোতে প্রিন্টিং- ছাপাগত কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হলে তা আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

ঢাকা- জুন, ২০২৪।

বিনীত

জহিরুল হক

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জনাব বেলাল মাহমুদ ভাইয়ের লিখিত সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা বইটি সংশোধন ও সংযোজনের উদ্দ্যেশ্যে আমার নিকট পাঠিয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত ব্যস্ততার কারণে বানানসহ খুঁটিনাটি বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বইটি আমি এক নজরে দেখার চেষ্টা করেছি। উক্ত বইটি লেখার ধারাবাহিকতা ও সুচিপত্র দেখে আমি আনন্দিত হয়ে ভাইজানকে যথাসম্ভব সংশোধন ও সংযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি। তা সত্ত্বেও মৌলিক কোন ভুলভ্রান্তি পাঠকদের নজরে পড়লে লেখককে জানানোর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তায়ালা বেলাল মাহমুদ ভাইয়ের সহজ পদ্ধতিতে কুরআন ও ইসলাম শিক্ষা বই খানার প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। ভাইজানসহ-আমাদের সবাইকে বাকীজীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিয়োজিত রেখে কাজ করে পরকালে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মদ আবুল হুসাইন খান
ইমাম, ইস্ট লন্ডন মসজিদ, লন্ডন, ইউ, কে
জুন, ২০২৪

আমার মরহুম পিতা-মাতার নামে উৎসর্গ

আমার জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মায়ের ঋণের সমুদ্র অতি গভীর ও বিস্তৃত যা অতিক্রম করা কখনও সম্ভব নয়। অসুস্থ শরীরে ব্যথিত অন্তরে বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রমে লিখা, **(১) সহজ পদ্ধতিতে করআন ও ইসলাম শিক্ষা, (২) পারিবারিক মাদরাসার গুরুত্ব এবং জান্নাতি কাফেলা ও (৩) মুমিনের গুণাবলী ও দৈনন্দিন যিকির ও দোয়া** বই তিনটি বইয়ের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদের নাজাতের উপায় হিসাবে আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন মর্যাদার সামনে কম্পিত হৃদয়ে সিক্ত নয়নে অবনত মস্তকে উৎসর্গ করছি।

হে আল্লাহ তোমার নিকট আমার আবেদন আমার মরহুম ও মরহুমা আব্বা-আম্মাকে পরকালীন সময় আযাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করিও। তারা যেভাবে শিশুকালে আমাদেরকে দয়া-মায়া, আদর-সোহাগ দিয়ে লালন পালন করেছেন- তেমনি তুমি তোমার রহম ও করম দিয়ে তাদেরকে পরকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ দান করেন:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

মহান মালিকের দরবারে প্রার্থনা:

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

"হে আমার রব আমাকে নামায প্রতিষ্ঠকারী করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের পাঠাও যারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে)। হে পরওয়ারদিগার! আমার দোয়া কবুল করো। হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।" (সূরা ইবরাহীম-১৪: ৪০-৪১)

প্রথম খণ্ড

কুরআন পরিচিতি ও শিক্ষা

১. কুরআন পরিচিতি ও গ্রন্থায়নের ইতিহাস

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতিকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কিতাব লওহে মাহফুযে সংরক্ষিত ছিল। তেমনি সেখান থেকে সর্বপ্রথম পূর্ণ কুরআন একই সাথে দুনিয়ার আসমানে নাযিল হয়। পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-এর নবুয়তের সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী নবী (সা.)-এর নিকট ধীরে ধীরে নাযিল হয়। আর কোনো রকম সংশয় ছাড়াই আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন গ্রন্থাকারে ছিল না। বরং সাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে এবং পাথর, চামড়া ইত্যাদির উপর লিখিত হয়েছিল। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে রাসূলুলাহ (সা.) সঙ্গে সঙ্গে তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন এবং তার থেকে শুনে সাহাবায়ে কেরামও মুখস্থ করতেন। আবার রাসূলুলাহ (সা.) নির্দিষ্ট ওহী লেখকদের ডেকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এটাই ছিল রাসূলুলাহ (সা.) এর যুগের কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজে কুরআন সাহাবী শহীদ হন। এমন হলো কুরআন বিলুপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। তখন খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ওমর (রা.) এর পরামর্শে আলকুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওহী লেখক সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) এর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের হেফাজাতকৃত এবং লিখিত অংশগুলো মিলিয়ে কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমত উক্ত কপি ওমর ফারুক (রা.) এর নিকট জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে তার ইন্তেকালের সময় তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষণের জন্য হস্তান্তর করেন।

তৃতীয় খলীফা উসমান গনী (রা.) এর আমলে ইসলাম ও ইসলামি সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে অনারবদের মাঝে কুরআনের শিখন ও তিলাওয়াতের উচ্চারণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। সাহাবী হুযায়ফা (রা.) প্রথম এ বিষয়ে খলীফা উসমান গণী (রা.) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার কথা সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনার সিদ্ধান্তক্রমে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটিকে এক ও অভিন্ন কুরাইশী ভাষায় আল-কুরআনের মাসহাব প্রস্তুতের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ কমিটির প্রতি নির্দেশ ছিল, আল-কুরআন এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে কুরাইশের উচ্চারণ-রীতি বহাল থাকে। কেননা, রাসূলুলাহ

(সা.) কুরাইশী ছিলেন। তাঁরা হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত কপিটি সম্মুখে রেখে আরো যাচাই করে কুরআনের সর্বমোট ছয়টি কপি প্রস্তুত করেন। যা 'মাসহাফে উসমানি' নামে পরিচিত। উসমান গনী (রা.) এক কপি নিজের কাছে রেখে বাকি কপিগুলো প্রত্যেক শহরে একটি করে পাঠিয়ে দেন। যাতে প্রেরিত কপির সাথে মিলিয়ে সবাই নির্ভুলভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। উক্ত কপিসমূহ নির্ভুল ও নির্ভযোগ্য বলে সমগ্র উম্মত মেনে নেয়। উসমান গনী (রা.) এর খেলাফত আমলে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত মাসহাফ অদ্যাবধি সমগ্র দুনিয়াতে পঠিত হচ্ছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই পঠিত হতেই থাকবে।

২. কুরআন শেখার সুফল ও না শেখার কুফল

৭ বৎসরের সন্তান কুরআনের হাফেয! আবার তাঁর বাবা কুরআন পড়তে জানেনা। পবিত্র কুরআন আল্লাহর নিকট হতে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী ও মানব জাতির জন্য গাইড লাইন। দিক নির্দেশনা। পথ প্রদর্শক। সংবিধান ও হেদায়েতের উৎস। কুরআন ছাড়া দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। ইহা শিক্ষা করা ফরয। কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে বলেন–

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ.

"যিনি আপনার জন্য কুরআনকে ফরয করেছেন।" সূরা আল কাছাছ : ৮৫

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ.

"পড়ো (হে নবী), তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। সূরাআলাক: ৯৬: ১।

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ.

"হে নবী! তোমার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে, তা তেলাওয়াত করো।"
সূরা আনকাবুত: ২৯: ৪৫।

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ط إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

"ঈমানদারদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ফাতির, ৩৫:২৮)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলবেন- হে আমার রব অবশ্যই আমার জাতি কুরআনকে একটি পরিত্যাজ্য বিষয় মনে করেছিল।" (সূরা আল ফোরকান-৩০)।

যারা দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় কুরআন শিখে নাই, অথবা কুরআন শেকার জন্য চেষ্টাও করে নাই; রাসূলুল্লাহ (সা.) বাদী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করবেন। তিনি বলবেন তারা কুরআন বুঝা ও আমলে যত্নবান ছিল না।

রাসূলের মামলা গ্রহণ করে আল্লাহ বলবেন আমি কুরআনের আদেশ অমান্যকারী সকল আমল বিনষ্ট করে অগ্রহণযোগ্য করে দেব। কুরআনের শিক্ষা ফরয করার ব্যাপারে আল্লাহ আরো বলেন–

اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ.

"কুরআনের আয়াত অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর ইন্তেকাল মুহূর্তে ফেরেস্তাগণ তার চেহারা ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করতে থাকবে। বলবে তুই তোর যান বের করেদে আজ তুই আজাব ভোগ কর।" সূরা আনয়াম : ৯৩

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسْاَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ বলেন– "যারা নিজেদের কুরআনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যিই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো। সূরা আল হিজর-৯১- ৯২।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ.

"আল্লাহ তাদেরকে সালাম জানিয়ে ফেরেস্তাদের দ্বারা অভিনন্দন জানিয়ে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন।" সূরা যুমার : ৭৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : কুরআন আখেরাতে পক্ষে বা বিপক্ষের দলিল হবে। (মুসলিম শরীফ)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

"বস্তুত এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৮)

এ কুরআন কখন ভুল বলে না; যে তাকে শুধরাতে হবে। কখন এঁকে-বেঁকে চলে না, যে তাকে সোজা করে দিতে হবে। এর বিস্ময়ের কোন শেষ নেই এবং বহুবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তা পুরানো হয় না। তোমরা কুরআন পাঠ কর, কেননা আল্লাহ, তোমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য প্রতি অক্ষরে দশটা সওয়াব দান করবেন। হাদীসে কুরআন পাঠের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন: তিন ব্যক্তি কিয়ামতের প্রাক্কালীন মহা আতঙ্কে আতঙ্কিত হবে না। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়লো এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে কুরআনের বিধান অনুযায়ী তাঁদের নেতৃত্ব করলো, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর হক বান্দার হক সুষ্ঠুভাবে পরিপালন করে।" (তাবরানী)

৩. কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ.

"আমি আপনার নিকট সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি মানুষের (হেদায়েতের) জন্যে।" (সূরা আয-যুমার ঃ ৪১)

কুরআন অপরিবর্তনীয় আসমানী কিতাব। এর পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

"তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার প্রতি যে অহী নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর। তার কথা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই।" সূরা কাহাফ ঃ ২৭

এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহর রজ্জু যা অবলম্বনে মানুষ। হিদায়েত লাভ করে আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে পারে। কুরআন হচ্ছে সমুজ্জ্বল জ্যোতি, যা দ্বারা পথহারা মানুষ আলোর সন্ধান লাভ করে আলোকিত হতে পারে। কুরআন হচ্ছে রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ চিকিৎসা, যা দ্বারা মানুষ ঈমানী, শারীরিক ও মানসিক রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।" সূরা বনী ইসরাইল: ৮২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ○

"রমযান এমন একটি মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন। যা মানুষের জন্যে হেদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল।" (সূরা আল-বাকারা: ১৮৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجَا ○

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এতে তিনি বক্রতা অপূর্ণতা রাখেননি।" (সূরা কাহাফ ঃ ১)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সঠিক পথ-নির্দেশনার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের নিকট যে সকল আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তন্মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হলো আল কুরআন। ইহা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। প্রতিদিন গভীর অভিনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো-উপলব্ধি করে আল্লাহর হুকুমের সত্যতা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয়াই মু'মিন জীবনের লক্ষ্য। এ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কুরআন তিলাওয়াতের সাথে-সাথে বুঝে পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু সকল জ্ঞানের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে কুরআন, সেহেতু নিয়মিত এ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বহুমুখী জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা যায়।

জীবনকে সুন্দর ও সৌন্দর্যময় করে গড়ে তুলতে এবং ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে কুরআনের শিক্ষা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য কুরআনকে বেশী বেশী অধ্যয়ন করে খোদায়ী বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অতীব জরুরি। তাই কুরআন শিক্ষার গুরুত্বে মুসলিম শরীফের হাদীস–

عَنْ اَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত- "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারীর) উপর ফরয।" (ইবনে মাজাহ)

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন: আল্লাহর কোন ঘরে কোন একদল মানুষ সমবেত হয়ে যদি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অধ্যয়ন করে এবং অপরকে তা শেখায়, তবে তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ হয় ও রহমত দিয়ে তাদেরকে ঢেকে ফেলা হয়। "ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।" (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

আলোচ্য হাদীসখানায় কুরআন অধ্যয়নের ফযীলতের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাই যথার্থভাবে (১) বিশুদ্ধ তিলাওয়াত (২) অর্থ অনুধাবন (৩) পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা (৪) বুঝ অনুযায়ী আমল (৫) পরস্পরকে সঠিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

কুরআন শিক্ষার গুরুত্বের হাদীস:

عَنْ عُثْمَانُ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ

উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়।" (সহীহ বুখারী ৫২৭৬, তিরমিযী-২৯০৭)।

مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

মু'আজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "জান্নাতের চাবি হল- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এই সাক্ষ্য দেয়া।" (মুসনাদে আহমাদ-২২১০২)

عَنْ انَسِ بْنِ مَالِكَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۞

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "যে জ্ঞানের সন্ধানে বাহির হয় সে আল্লাহর পথে বাহির হয়।" (তিরমিযী-২৬৪৭)।

أَهْلُ الْقُرْاٰنِ هُمْ أَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "আল-কুরআনের ধারক-বাহকরা আল্লাহর পরিবার ও তাঁহার বিশেষ লোক।" (আবু দাউদ-৩/২২৩৮)

اِقْرَاءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّاَصْحَابِهٖ ـ

আবু উমামাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "তোমরা কুরআন পড়। কুরআন কিয়ামতের দিন কুরআন ওয়ালাদের জন্য সুপারিশকারী হবে।" (মুয়াত্তা-৩/২)।

সন্তানদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্বারোপ করে বর্ণিত আয়াতসমুহ

আল্লাহর নির্দেশ:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।" (সূরা তাহরীম, ৬৬:০৬)

নূহ আ.-এর কত দরদের সাথে আপন সন্তানকে বলেন-

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ.

"নৌকা তাদেরকে নিয়ে পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে ভেসে চলতে লাগলো। নূহের ছেলে ছিল তাদের থেকে দূরে। নূহ চিৎকার করে তাকে বললো, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফেরদের সাথে থেকো না।" সূরা হূদ১১ : ৪২।

ইবরাহীম আঃ ও ইয়াকুব আঃ তাঁদের সন্তানদের একথারই অসিয়ত করলেন যে, হে আমাদের সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন মুসলিম অবস্থায়ই হয়। যখন ইয়াকূব আ:-এর মৃত্যুর সময় এসে গিয়েছিল; যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল, "আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবূদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও মাবূদ। আমরা কেবল তাঁরই অনুগত।" -সূরা বাকারা ২ : ১৩২-১৩৩।

ইসমাঈল আঃ তাঁর পরিবারকে অসিয়তের বিষয়ে কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে, "আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিল রসূল ও নবী। সে নিজের পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতো এবং নিজের রবের কাছে ছিল একজন পছন্দনীয় ব্যক্তি।" সূরা মারইয়াম: ১৯: ৫৪-৫৫।

সন্তানের প্রতি লুকমান হাকীমের উপদেশ বাণী বিবৃত হয়েছে- "এবং স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চিত জেনে রাখো, শরীক চরম জুলুম অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক অন্যায়।" -সূরা লুকমান ৩১ : ১৩।

সন্তানদের প্রতি লোকমানের উপদেশসমুহ

সূরা লোকমানঃ ৩১ঃ ১৩-১৯ঃ

- **উপদেশ- ১ :** 'হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম।'
- **উপদেশ- ২ঃ** অতপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রসঙ্গক্রমে পিতা-মাতা সম্পর্কে তার নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকারের কথা, তাঁরা মুশরিক হলে তাঁদের প্রতি সদাচরণের কথা এবং তাঁদের (বাতিল) দ্বীন কবুল করার ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য না করার কথা উল্লেখ করেছেন।
- **উপদেশ- ৩ঃ** মানুষের প্রতি জুলুম করতে বারণ করলেন, যদিও তা সর্ষে পরিমাণ হয়, এমনকি তা দরজা জানালাহীন কিংবা ছিদ্রবিহীন কঠিন পাথরের মধ্যে রাখা হলেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটি সম্পর্কে অবগত থাকেন।
- **উপদেশ- ৪ঃ** 'হে বৎস! নামায কায়েম কর।'
- **উপদেশ- ৫ঃ** 'সৎকর্মের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কর্ম নিষেধ করবে এবং বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করবে।'
- **উপদেশ- ৬ঃ** 'অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্বতভাবে বিচরণ করো না। কারণ, আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'
- **উপদেশ- ৭ঃ** তুমি যখন কথা বলবে তখন প্রয়োজনা অতিরিক্ত উচ্চ স্বরে কথা বলবেনা। কারণ, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হল গাধার স্বর।

পরিবারের নেককার সদস্যদেরকে নিয়ে এক সাথ জান্নাতের থাকার উপায় হলো সকলে মিলে ঈমান ঠিক রেখে আমল করে মৃত্যুবরন করা। দেখুন, কুরআন মজিদের এরশাদ- "তাদের অবস্থা হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা সবর করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খচর করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস। তারা নিজেরা (ঈমানদার ও নেক আমলকারীরা) তার মধ্যে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদারা ও স্ত্রী-সন্তানদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্মশীল হবে তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতারা সবদিক থেকে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে এবং তাদেরকে বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে সবর করে এসেছো তার বিনিময়ে আজ তোমরা এর অধিকারী হয়েছো।"- কাজেই কতই চমৎকার এ আখেরাতের গৃহ!" সুরা আর রাদঃ ২২-২৪।

৪. তাজবিদ শিক্ষা

তাজবিদ (تَجْوِيْدٌ) শব্দের অর্থ সুন্দর করা

আরবী ২৯টি হরফ তার উচ্চারণের স্থান হতে সঠিকভাবে তার বৈশিষ্ট রক্ষা করে পড়াকে তাজবিদ বলে। পবিত্র কুরআনকে সহীহ ও শুদ্ধভাবে পড়তে হলে তাজবিদের গুরুত্ব অপরিহার্য। তাজবিদ ব্যতীত কুরআন পড়লে মাখরাজের উচ্চারণ ও মাদের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে কুরআনের অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। এবং অর্থের পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে লাহানে ভুল হয়। লাহান দুই প্রকার–

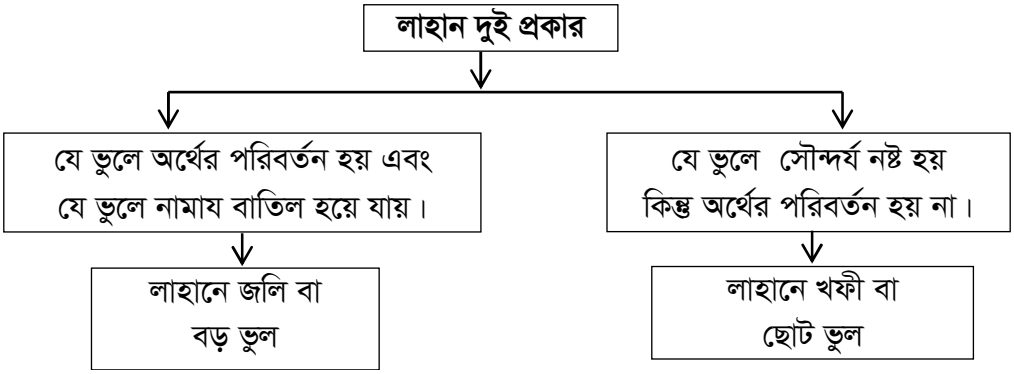

লাহানে জলী ও লাহানে খফীর উদাহরণঃ

	লাহানে জলি বা বড় ভুল			লাহানে খফী বা ছোট ভুল		
(১)	বলুন =	قُلْ	(২)	অতঃপর =	مِنْ بَعْدِ	
	খাও =	كُلْ		অতঃপর =	مِنْ بَعْدِ	

আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে আসমানী কিতাব। এ কিতাবকে যে সম্মান করে শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করবে; আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করাকে আল্লাহ আমাদের জন্য অপরিহার্য করেছেন। কুরআনের সূরা আল মুযযাম্মিল-এর ৪নং আয়াতের এরশাদ দেখুন–

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

"অর্থাৎ তোমরা কুরআনকে থেমে থেমে পাঠ করো।"

ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে বলা হয়েছে, কুরআন তিলাওয়াত করা নফল। আর কুরআন বিশুদ্ধ করে পড়া ফরয। অতএব কেউ নফল ইবাদত করতে গিয়ে ফরয তরক করতে পারেন না। তাই বিশুদ্ধ তেলাওয়াত সবার জন্যই অত্যাবশ্যক।

৫. হুরূফে তাহাজ্জী বা আরবী বর্ণমালা: ২৯টি

ج		ث		ت		ب		ا	
জ্বী--ম	جِيْم	ছা	ثَا	তা	تَا	বা	بَا	আলিফ	اَلِفْ
ر		ذ		د		خ		ح	
র-	رَا	যা-ল	ذَال	দা-ল	دَال	খ-	خَا	হা	حَا
ض		ص		ش		س		ز	
দ্ব-দ	ضَاد	স্ব-দ	صَادْ	শী--ন	شِيْن	ছী-ন	سِيْن	যা-	زَا
ف		غ		ع		ظ		ط	
ফা-	فَا	গঈ-ন	غَيْنِ	আঈ--ন	عَيْنْ	জ্ব	ظَا	ত্ব	طَا
ن		م		ل		ك		ق	
নু-ন	نُوْن	মী-ম	مِيْمْ	লা---ম	لَامْ	কা-ফ	كَافْ	ক্ব--ফ	قَافْ
		ي		ء		ه		و	
ইয়া-	يَا	ইয়া-	يَا	হামযাহ্	هَمْزَه	হা-	هَا	ওয়া-ও	وَاوْ

মাখরাজ চেনার কয়েকটি পদ্ধতি ঃ

হরফকে তার সঠিক উচ্চারণের জন্য হরফের উপর সাকিন দিয়ে তার আগে যবর দিলে মাখরাজের উচ্চারণ সঠিকভাবে আসতে সহায়ক হবে। যেমন-

اَجْ	اَبْ	اَصْ	اَقْ

৬. হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে

আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি

(৩) غ خ	(২) ع ح	(১) ء ه
তিন নাম্বার মাখরাজ হলকের শেষ হতে (গঈ-ন, খ)	দুই নাম্বার মাখরাজ হলকের মধ্যখান হতে (আঈ-ন, হা)	এক নাম্বার মাখরাজ হলকের শুরু হতে (হামযাহ্, হা)
(৬) ج ش ي	(৫) ك	(৪) ق
ছয় নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (জ্বী-ম, শী-ন, ইয়া)	পাঁচ নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (কা-ফ)	চার নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (ক্ব-ফ)
(৯) ن	(৮) ل	(৭) ض
নয় নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (নূ-ন)	আট নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার মাড়ির সঙ্গে লাগিয়ো (লা-ম)	সাত নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার গোড়ার কিনার, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (দ্ব-দ)
(১২) ص س ز	(১১) ط د ت	(১০) ر
বার নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (স্ব-দ, সী-ন, যা-)	এগার নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে (ত্ব, দা-ল, তা)	দশ নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে (র-)
(১৫) و ب م	(১৪) ف	(১৩) ظ ذ ث
পনের নাম্বার মাখরাজ দুই ঠোঁট হতে (ওয়া-ও, বা-, মী-ম) উচ্চারিত হয়।	চৌদ্দ নাম্বার মাখরাজ নীচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (ফা-)	তের নাম্বার মাখরাজ জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে (জ্ব, যা-ল, ছা)
(১৭) اَمَّ اَنَّ	َا ُو ِي	(১৬)
সতের নাম্বার মাখরাজ নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।	ষোল নাম্বার মাখরাজ মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের হুরুফ পড়া যায়।। মদ্দের হরফ তিনটি। যথা– আলিফ, ওয়াও, ইয়া	

মাখরাজ উচ্চারণের কয়েকটি আরবী স্থানের নামঃ

(১) জাওফ = মুখ ও কণ্ঠনালীর খালি জায়গা।

(২) হলক = মুখ ও কণ্ঠনালীর খালী অংশ।

(৩) লিসান = জিহ্বা।

(৪) শাফাতাইন = দুই ঠোঁট।

(৫) খাইশুম = নাসিকা

আরবী হরফের উচ্চারণ সহীহ না হলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। তাই হরফের উচ্চারণের পার্থক্য বুঝেপবিত্র কুরআন পড়তে হয়। কখন ط (ত্ব) কে ت (তা) ج (জ্বীম) কে ز (যা) পড়া যাবে না। সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে লাহানে জলী না হয়।

৭. কতিপয় হরফের পার্থক্য

ح — ه	(২)	ط — ت	(১)
ص — س — ث	(৪)	ج — ز	(৩)
ظ — ذ	(৬)	ض — ظ — د	(৫)
و — ب — م	(৮)	ق — ك	(৭)

৮. হরকত, জযম, তাশদীদ

ُ	َ	ِ
উপরের গোল মাথা ওয়ালাটির নাম পেশ	উপরের কোণাকোণী আঁকটির নাম যবর	নিচের কোণাকোণী আঁকটির নাম যের

হরকত ঃ এক যবর এক যের এক পেশকে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।

নিচের তিন দাঁত ওয়ালাটির নাম তাশদীদ	কুরআন মজীদে তিন রকমের জযম পাওয়া যায়		
ّ	ْ	ْ	^

হরকত, জযম, তাশদীদ-এর ব্যবহার

اَ	بَ	تَ	ثَ	جَ	حَ	خَ	دَ	ذَ	رَ	زَ	سَ	شَ	صَ	ضَ
طَ	ظَ	عَ	غَ	فَ	قَ	كَ	لَ	مَ	نَ	وَ	هَ	لَا	ءَ	يَ
اِ	بِ	تِ	ثِ	جِ	حِ	خِ	دِ	ذِ	رِ	زِ	سِ	شِ	صِ	ضِ
طِ	ظِ	عِ	غِ	فِ	قِ	كِ	لِ	مِ	نِ	وِ	هِ	لِا	ءِ	يِ
اُ	بُ	تُ	ثُ	جُ	حُ	خُ	دُ	ذُ	رُ	زُ	سُ	شُ	صُ	ضُ
طُ	ظُ	عُ	غُ	فُ	قُ	كُ	لُ	مُ	نُ	وُ	هُ	لُا	ءُ	يُ
اً	بً	تً	ثً	جً	حً	خً	دً	ذً	رً	زً	سً	شً	صً	ضً
طً	ظً	عً	غً	فً	قً	كً	لً	مً	نً	وً	هً	لاً	ءً	يً
اٍ	بٍ	تٍ	ثٍ	جٍ	حٍ	خٍ	دٍ	ذٍ	رٍ	زٍ	سٍ	شٍ	صٍ	ضٍ
طٍ	ظٍ	عٍ	غٍ	فٍ	قٍ	كٍ	لٍ	مٍ	نٍ	وٍ	هٍ	لٍا	ءٍ	يٍ
اٌ	بٌ	تٌ	ثٌ	جٌ	حٌ	خٌ	دٌ	ذٌ	رٌ	زٌ	سٌ	شٌ	صٌ	ضٌ
طٌ	ظٌ	عٌ	غٌ	فٌ	قٌ	كٌ	لٌ	مٌ	نٌ	وٌ	هٌ	لٌا	ءٌ	يٌ

৯. মাদ্দ-এর বিবরণ ও প্রকারভেদ

আরবি হরফ টেনে পড়াকে মাদ্দ বলে।

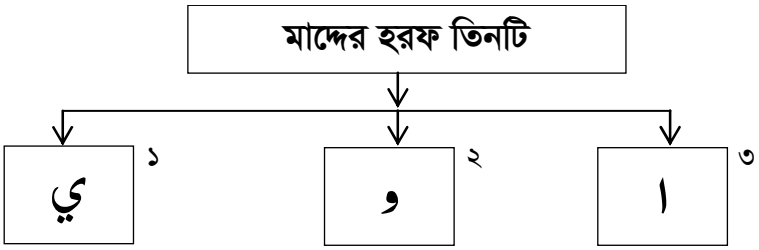

(১) খালি আলীফ যবরের বাম পার্শ্বে হলে, এক আলীফ টেনে পড়তে হয়। যথা- بَا، تَا، ثَا

(২) ওয়াও সাকিন, পেশের বাম পার্শ্বে হলে, এক আলীফ টেনে পড়তে হয়। যথা- بُوْ، تُوْ، ثُوْ

(৩) ইয়া সাকিন যেরের বাম পার্শ্বে হলে, এক আলীফ টেনে পড়তে হয়। যথা- بِيْ، تِيْ، ثِيْ

(৪) হরকতের মাধ্যমে মাদ্দের ব্যবহার

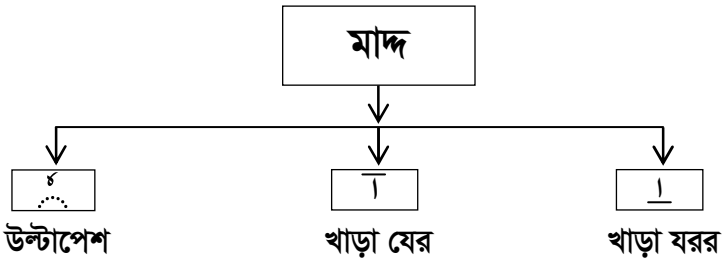

হরফের উপরে নিচে হলে এক আলিফ টানিয়া পড়তে হয়। যথা- بٰ، بٖ، بٗ

উপরিউক্ত মাদ্দগুলোকে (মাদ্দ-এ– আসলি বলে। এই মাদ্দগুলোকে সর্বদাই এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। মাদ্দ ১০ (দশ) প্রকার :

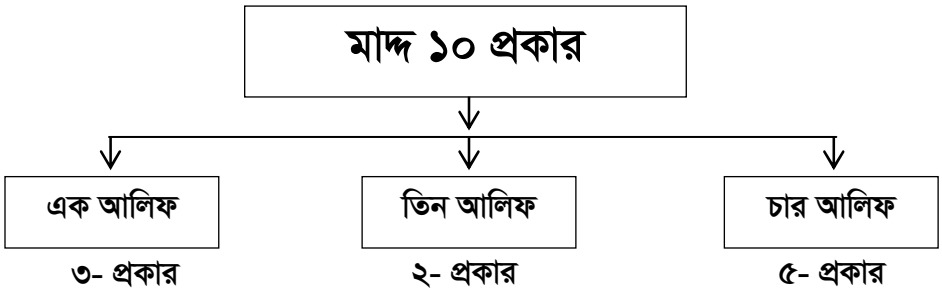

এক আলিফ মাদ্দ ৩ প্রকার

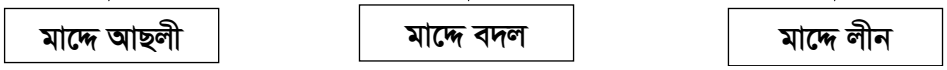

(১) মাদ্দে আছলী ঃ ইহা মূল মাদ্দ- একে সর্বদাই এক আলিফ টেনে পড়তে হয়- بَا بُوْ بِيْ

(২) মাদ্দে বদল (মানে পরিবর্তন) عَ

যদি মাদ্দে আছলী হামযাহ হরফের পরে অর্থাৎ যখন আলিফ যবরের বাম পার্শ্বে (بَ ءا)
ওয়াও পেশের বাম পার্শ্বে (بُ ءوْ)

ইয়া যেরের বাম পার্শ্বে (بِ ءيْ)

আসে এবং ঐ যবর, পেশ, যের বিশিষ্ট অক্ষরটি হামযাহ হয়। তখন তাকে মাদ্দে বদল বলে। প্রকাশ থাকে যে হামযাহ হরফে খাড়া যবর-খাড়া যের ও উল্টো পেশ হলেও মাদ্দে বদল হবে। যথা-

اَأَدَمْ পরিবর্তন হয়ে اٰدَمْ হয়েছে।

اٰدَمْ	اُوْدَمْ	اِيْدَمْ
اٰمَنَ	اُوْمِنَ	اِيْمَانًا

(৩) লীনের হরফ ও মাদ্দে লীন ঃ লীন অর্থ নরম।

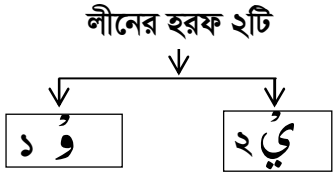

(ক) যবরের বাম পার্শ্বে وْ (ওয়াও) সাকিন- يَوْ ইয়াও

(খ) যবরের বাম পার্শ্বে يْ(ইয়া) সাকিন بَيْ হলে তার উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়।যেমনভাবে হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয়। যথা-تَيْ ثَيْ

মাদ্দে লীন ঃ লীনের হরফের পরের হরফে থামলে ঐ হরফকে সাকিন দিয়ে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যথা - خَوْفٍ بَيْتٍ صَيْفٍ

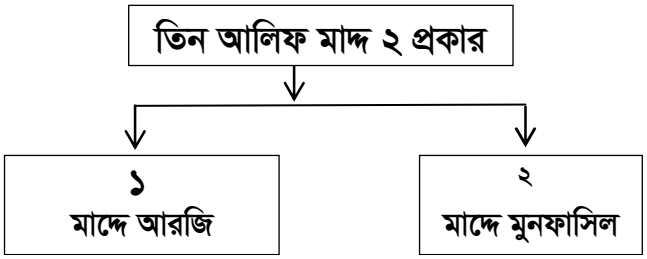

(৪) মাদ্দে আরজি ঃ সুকুন - (মাদ্দ আল আরজি-সুকুন) মাদ্দের হরফের পরের হরফে থামলে ঐ হরফকে সাকিন দিয়ে ৩ (তিন) আলিফ টেনে পড়তে হয়।

যথা-اَلْعٰلَمِيْنَ اَلْمَاعُوْنَ بِالدِّيْنَ

(৫) মাদ্দে মুনফাসিল ঃ (উপরের চিহ্নচিকন ~) মাদ্দের হরফের পরের হরফে (লম্বা) হামযাহ হলে পরবর্তী শব্দে তিন আলীফ টেনে পড়তে হয়। যথা- لَآ اَعْبُدُ لَآ اُقْسِمُ وَمَآ اَدْرٰكَ

৪ আলীফ মাদ্দ ৫ প্রকারঃ

(৬) মাদ্দে মুত্তাসিল ঃ (উপরের চিহ্ন মোটা-) মাদ্দের হরফের পরের হরফে গোল হামযাহ (ء) হলে একই শব্দে ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। মাদ্দ আল মুত্তাসিলের উদাহরণ–

যথা- اِذَا جَآءَ - شَآءَ

কালমী কাকে বলে?

অর্থবোধক কয়েকটি হরফকে একত্রিত করে পড়া

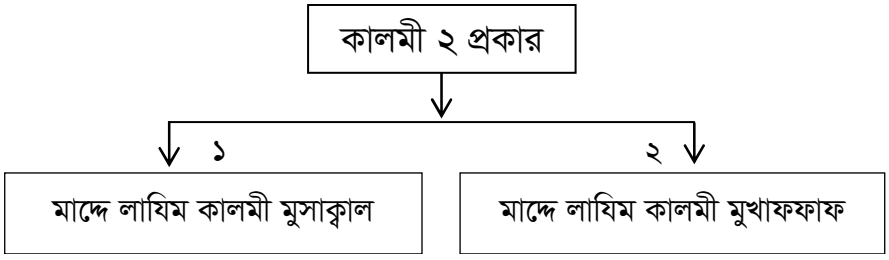

(৭) মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল ঃ কালেমার মধ্যে (কালেমা অর্থ শব্দ) মাদ্দের হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ থাকলে একে মাদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল বলে। ডান দিকের

হরকতকে ৪ আলিফ টানিয়া বামের তাশদীদের সঙ্গে মিলাইয়া পড়তে হয়। (মাদ্দের হরফ আর তাশদীদ সমান শব্দে) যথা- دَآبَّةٍ ، جَآنَّ ، ضَآلًّا

(৮) মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ ঃ কালেমার মধ্যে (কালেমা অর্থ শব্দ) মাদ্দের হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে জযম থাকলে একে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ বলে। ডান দিকের হরকতকে ৪ আলিফ টানিয়া বামের জযমের সঙ্গে মিলাইয়া পড়তে হয়।

যথা- آلْئٰنَ

হরফী ২ প্রকার

১	২
মাদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল	মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ

(৯) মাদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ থাকলে ইহাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল বলে। হরফের নামটি ৪ আলিফ টেনে বামের তাশদীদের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হয়। যথা- طٰسٓمّٓ - الٓمّٓ - الٓمّٓصٓ

(১০) মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্ফাফ ঃ হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ না থাকলে ইহাকে মাদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ বলে। শুধু হরফের নামটি ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়।

যেমন- صٓ - طٰسٓ - يٰسٓ

বানান প্রক্রিয়া ঃ دُ   صٓا

হরফী মুখাফফাফ   মাদ্দ আছলী

হরফে মুকাততায়াতঃ হরফে মুকাততায়াত মানে কাটা কাটা অক্ষর। কুরআনের **১১৪**টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরার শুরুতে হরফে মুকাততায়াত রয়েছে। ইহা পড়ার নিয়ম আছে। আলিফ আর হামজাহ তাড়াতাড়ি পড়তে হয়। আর যতটা হরফে "আ" আওয়াজ আছে ঐ হরফগুলোকে (১) এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমনঃ ه - ط - ر - ي - ح

আর যে হরফগুলোতে "আ" আওয়াজ নেই। সে হরফগুলোকে (৪) চার আলীফ টেনে পড়তে হয়।

যেমনঃ ص - ق - ع - ن - م

১০. মীম ছাকিনের বিবরণ

মীমের উপর ছাকিন অথবা জযমযুক্ত মীমকে মীম (مْ) ছাকিন বলে। ইহা ৩ প্রকার।

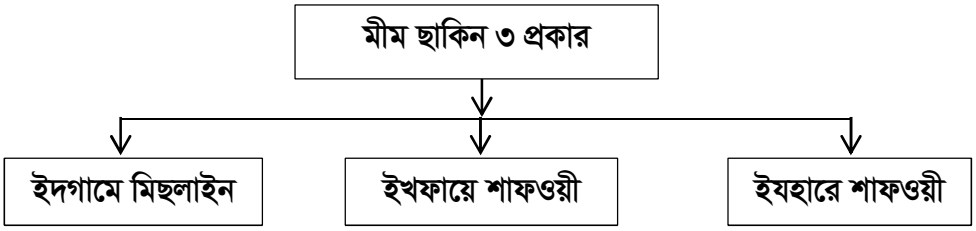

(১) ইদগামে মিছলাইন অর্থ মিলানোঃ মীম ছাকিনের পর মীম আসলে তখন তাকে মিলিয়ে গুণ্নাহর সাথে ২ হারাকাহ দীর্ঘ (লম্বা) করে পড়তে হয়। যথা ঃ

وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

এক নজরে (مْ) মীম ছাকিন

	ইদগাম মিছলাইন	ইখফা শাফাওয়ী	ইযহারে শাফাওয়ী
অর্থ	মিলানো	গোপন-গুন্নাহ	পরিষ্কার
হরফ	একটি م	একটি ب	বাকী ২৬টি
নিয়ম	মিলিয়ে গুন্নাহ করা	মীম ছাকিন	পরিষ্কার করে পড়া
	২ হারাকাহ দীর্ঘ করা	গোপন করা	কোন দীর্ঘ না করা
		২ হারাকাহ দীর্ঘ করা	
উদাহরণ	وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ	قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ	اَلْحَمْدُ لَهُمْ فِيْهَا

(২) ইখফা শাফাওয়ী ঃ মীম ছাকিনের পর যদি বা (ب) আসে তখন মীম ছাকিনকে গোপন করে গুন্নাহর সাথে পড়তে হয়। যথা-قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ

(৩) ইজহার শাফাওয়ী ঃ মীম ছাকিনের পর যদি ২৬টি হরফের যে কোন একটি হরফ আসে, তখন মীম ছাকিনটিকে পরিষ্কার করে গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হয়। ইহাতে কোন দীর্ঘ (লম্বা) করা যাবে না।

যথা- لَهُمْ فِيْهَا اَلْحَمْدُ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ

১১. নূন ছাকিন ও তানভীনের বিবরণ

জযমযুক্ত নূনকে নূন ছাকিন বলে। দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানভীন বলে।

নূন ছাকিন ও তানভীনপড়ার ৪ নিয়ম

- ইযহার
- ইখফা
- ইদগাম
  - ইদগামে বা গুন্নাহ
  - ইদগামে বেলা গুন্নাহ
- ইক্বলাব/ক্বলব

১। ইযহারের ৬ হরফ ঃ خ غ ح ع ه ء

ইযহার অর্থ স্পষ্ট করে পড়া। নূন ছাকিন ও তানভীনের পরে ইযহারের ৬ হরফের যে কোন একটি হরফ আসলে উক্ত নূন ছাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমন-

عَذَابٌ اَلِيْمٌ - مِنْ خَيْرٍ - اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

২। ইখফার ১৫ হরফ ঃ ك ق ف ظ ط ض ص ش س ز ذ د ج ث ت

ইখফা অর্থ নাকের বাঁশিতে গোপন করিয়া পড়া। নূন ছাকিন ও তানভীনের পরে ইখফার ১৫ হরফের যে কোন একটি হরফ আসলে, উক্ত নূন সাকিন ও তানভীনকে নাকের ভিতর লুকিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন- مِنْ شَرِّ - مَنْ ثَقُلَتْ - مِنْ قَوْلٍ

তবে হরফে মুস্তালিয়ার ৭টি হরফ خ ص ض غ ط ق ظ এর ১টি হরফ আসলে অবশ্যই মোটা করতে হবে। যেমন- كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

৩। ইদগামের ৬ হরফঃ ي ر م ل و ن (এই ছয়টি হরফকে একত্রে- يَرْمَلُوْنَ ইয়ারমালুন বলে) ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া।

ইদগাম ২ প্রকারঃ

- ১। ইদগামে বা গুণ্নাহ
- ২। ইদগামে বেলা গুণ্নাহ

ইদগামে বা গুন্নাহর হরফ ৪টি (نْ)(ي م و ن) নূন ছাকিন ও তানভীনের পরে ইদগামে বা গুন্নাহর ৪ হরফের যে কোন একটি হরফ আসলে নূন ছাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহসহ মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন– مَنْ يَّقُوْلُ – ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ – مِنْ مَّسَدٍ

ইদগামে বেলা গুন্নাহর ২ হরফ ঃ ر ل নূন সাকিন ও তানভীনের ر ل হতে যে কোনএকটি হরফ আসলে, গুন্নাহ ব্যতীত মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমনঃ مِنْ رَّبِّهِمْ، مِنْ لَّدُنْكَ، مِنْ رَّحْمَةٍ، لَئِنْ لَّمْ

* **ব্যতিক্রম ধর্মী ইদগাম -এ-** থাম মানে Complete Idgam & Idgam- এ নাকিছ মানে In complete Idgam Complet or direct ইদগাম সূরা কাফেরুন আয়াত-৪As: (এখানে) (د)দাল অস্পষ্ট, وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ

* **ইদগামে নাকিছ** (In complete Idgam)। সূরা আল-মায়িদা, আয়াত-২৮ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ ছাকিন ওয়ালা হরফ, হরফে মুস্তালিয়া হরফ হওয়ার কারণে হরফে মুস্তালিয়া হরফ টাস করে পড়ে যেতে হবে।

* **নূন ছাকিনের (نْ) ব্যতিক্রম ধর্মী রুল। সূরা বাকারা (১১৪)** যেমন- لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ নূন ছাকিন ও ইদগামের হরফ একই শব্দে আসার কারণে ইদগাম গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হবে। এখানে ইদগামে বা গুন্নাহ হবে না।

ইদগামে বা গুন্নাহের হরফ ৪টি। (ى م و ن) নূন ছাকিন ও তানভীনের পরে আসলে ঐ হরফে (ّ) তাশদীদ দিয়ে ইদগাম করে গুন্নাহের সহিত পড়তে হবে। যেমন- مَنْ يَّقُوْلُ

৪। ইক্বলাব হরফ ১টি ب

ইক্বলাব অর্থ পরিবর্তন করা। নূন সাকিন ও তানভীনের পরে **ب** হরফ আসলে উক্ত নূন ছাকিন ও তানভীনকে **م** দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

যেমন- مِنْ بَعْدِ اَلِيْمٌ بِمَا، مَنْ بَخِلَ

ব্যতিক্রম ঃ যদি একই হরফের মধ্যে ن নূন সাকিন ও তানভীনের পরে ইদগামের বা-গুন্নাহর ৪টি হরফের যে কোন ১টি হরফ আসে, তাহলে ইদগাম করে পড়তে হবে না। **ইহাকে ইযহারে মুতলাক বলে**। কুরআনে ৪টি স্থানে এ ধরনের ৪টি শব্দ আছে। ي م و ن

নূন সাকিনের পরে **و** আসলে صِنْوَانٌ ، قِنْوَانٌ

নূন সাকিনের পরে **ى** আসলে بُنْيَانٌ ، دُنْيَا

১২. ওয়াজিব গুন্নাহ

মীম ও নূনেরউপর (مّ نّ) তাশদীদ হইলে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। যথা-

انَّ - اَمَّ- اِنَّ - النَّاسِ - ثُمَّ - عَمَّ - اِنَّكُمْ - ظَنَّ - مِنَّ

১৩. اَللّٰهُ আল্লাহ্ শব্দে ل পড়ার নিয়ম

اَللّٰهُ শব্দ পড়ার নিয়ম ঃ আল্লাহ শব্দের ل এর পূর্বে যবর বা পেশ হলে আল্লাহ শব্দের লামকে পূর/মোটা করে পড়তে হয়। যেমন-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اِنَّ اللّٰهَ - اَللّٰهُمَّ - سُبْحَانَ اللّٰهِ

اَللّٰهُ শব্দের মাধ্যমে ل এর পূর্বে যের হলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক/পাতলা করে পড়তে হয়।

যথা- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

১৪. ক্বলক্বলার হরফের বিবরণ

ক্বলক্বলার অর্থ ধাক্কা দিয়ে পড়া বা প্রতিধ্বনি করে পড়া।

ক্বলক্বলার হরফ ৫টিঃ د ج ب ط ق এই পাঁচ হরফে জযম হলে ক্বলক্বলা (পাল্টা আওয়াজ) করে পড়তে হয়।

ক্বলক্বলা ২ প্রকারঃ

- ক্বলকলা কোবরা (বড়)
- ক্বলকলা ছোগরা (ছোট)

তবে শিখার ক্ষেত্রে ক্বলক্বলা হরফের ব্যবহার তিনভাবে পড়া যেতে পারে।

(১) ক্বলক্বলা হরফের উপর আয়াতের মাঝখানে সাকিন হলে সামান্য ক্বলক্বলা করতে হয়। যেমন- وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا

(২) ক্বলক্বলা হরফের উপর আয়াতের শেষে হরকত থাকলে ঐ হরকত কে সাকিন করে ক্বলক্বলা কোবরা করতে হয়। যেমন- اِذَا وَقَبَ - فِي الْعُقَدِ

(৩) ক্বলক্বলা হরফের উপরে আয়াতের শেষে তাশদদি হইলে ক্বলক্বলা কোবরা করে পড়তে হয়। যেমন- (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ) - (اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ) ক্বলক্বলা হরফ পড়ার উদাহরণ ইংরেজিতে এভাবে দেয়া যায়।

(১)	صَبْحًا	(২)	وَقَبَ	(৩)	وَتَبَّ
	Large		Larger		Largest

ক্বলক্বলা হরফের কিছু উদাহরণ ঃ

اَدْرَكَ	اَجْ	اَبْ	اَطْ	اَقْ
اُدْعُوْا	اِجْ	اِبْ	اِطْ	اِقْ
اَطْعَمَ	اُجْ	اُبْ	اُطْ	اُقْ

নাবর (اَنَّبْرُ) ঃ শব্দের মধ্যে যে হরফে আলাদা চাপ দিয়ে পড়তে হয়, যাতে করে আওয়াজ একটু জোরে শুনা যায়। যথা- اَلْحَقُّ—وَتَبَّ ক্বলক্বলা হরফে থাকলে **বেশি নাবর হয়।**

১৫. (ر) 'র'- হরফ মোটা ও চিকন করে পড়ার নিয়ম

* (ر) -র- কে কখন মোটা করে পড়তে হয়ঃ

(১) (ر)-র এর উপর যবর হলে (رَ) যেমন- رَفَعَ

(২) (ر)-র-এর উপর পেশ হলে- (رُ) যেমন- رُسُلٌ

(৩) (ر) -র ছাকিন তার ডান দিকে যবর হলে-(رْ) যেমন- اَرْحَمِ

(৪) (ر)-র ছাকিন তার ডান দিকে পেশ হলে-(رْ) যেমন- اُرْسِلَ

(৫) (ر) -র এর ছাকিন তার আগের হরফে ছাকিন ও তার আগের হরফে যবর হলে যেমন-(شَهْرْ)

(৬) (ر) -র ছাকিন তার আগের হরফে ছাকিন ও তার আগের হরফে পেশ হলে- যেমন –(خُسْرْ)

* উপরিউক্ত ৬ অবস্থায় (ر) র হরফকে মোটা (পোর) (Full mouth) করে পড়তে হয়। যেমন-

(رَ - زُ) - (يَرْ - مُرْ) - (شَهْرْ - خُسْرْ)

* (ر) র কে কখন চিকন করে পড়তে হয়?

(৭) (ر) -র এর নীচে যের হলে (رِ) যেমন- رِجَالٌ

(৮) (ر) -র এর উপর ছাকিন তার ডান দিকে যের হলে। যেমন– (فِرْعَوْنَ)

(৯) (ر)-র এর উপর ছাকিন তার আগের হরফে ছাকিন এবং তার আগের হরফে যের হলে (حِجْرْ)

(১০) (ر) -র ছাকিন তার ডাইনে ইয়া ছাকিন (অথবা ওয়াকফ হাওলাতে (ر) র ছাকিন) তার পূর্বে ইয়া ছাকিন তার পূর্বে যবর হলে যেমনঃ خَيْرِ

ر -র এর ব্যবহার

যেমন- ضَيْرٌ - عَسِيْرٍ - خَيْرٌ

(১১) ব্যতিক্রম ر(র) ছাকিন তার ডান দিকে যের তার পরের হরফ, **হরফে মুস্তালিয়া** হলে, তখন ঐ ر(র) কে মোটা (পোর-Full mouth) করে পড়তে হয়। যেমন- مِرْصَادٌ - فِرْقَةٌ - قِرْطَاسٌ (اِسْتِعْلٰى ء) ইস্তি'লা: যে হরফ উচ্চারণ করতে জিহ্বা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, ইহার অপর নাম হরফে মুস্তালিয়া। হরফে মুস্তালিয়ার হরফ ৭টি।

যেমন- خ ص ض غ ط ق ظ

এ ৭টি হরফ এক সাথে মনে রাখবার জন্য- একত্রে উচ্চারণ খুচ্চা -দ্বগত্বিন-ক্বিজ خُصَّ ضَغْطٍ - قِظْ by Serial এভাবেও অনেকে পড়ে- خ ص ض غ ط ظ ق

মুস্তালিয়া ৭টি হরফের উদাহরণ–

خ	خَالِدِيْنَ	اٰخِرِ	خُلِقَ	يَخْرُجُ
ص	صَلٰوةِ	صِرَاطَ	صُحُفِ	اَصْبَحَتْ
ض	ضَرَبَ	رَضِيَ	ضُرِبَ	فَضَالِ
غ	غَالِبُ	غَيْرِ	غُفِرَ	يَغْفِرُ
ط	طَالِبُ	عُطِّلَتْ	طُوْرِ	بَطْشَ
ق	خَلَقَ	يَقِيَ	قُتِلَتْ	اَقُوْمُ
ظ	ظَالِمَ	يُعْظِمُ	ظُلُمَاتِ	ظُلَمَ

১৬. গোল (ة) পড়ার বিবরণ

গোল ة পড়ার বিবরণ ঃ (তা মারবুতা) কোন শব্দের শেষে গোল (ة) (তা) থাকে। সে **ة** কে হা করে পড়তে হয়। **ة** গোল তা থাকার করণে গোল তাকে ছাকিন দিয়ে হা করে পড়তে হয়।

একে মারবুতা বলে। যেমন- اَلْقَارِعَةُ–مُؤْصَدَةٌ

১৭. আলিফে যায়েদা

আলিফে যায়েদা ঃ মানে অতিরিক্ত আলিফ– এই আলিফ লেখার সময় আসে। তবে পড়ার সময় পড়া যাবে না। যথা- يَوْمِ الدِّيْنَ - رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১৮. হামযাতুল ওয়াসল

আল কুরআনের অনেক আয়াতে আলিফ রয়েছে। যার উপর হারাকাহ (যের- যবর- পেশ) থাকে না। এই আলিফকে হামযাতুল ওয়াসল বলা হয়। একে সংযুক্ত হামযাও বলা যেতে পারে। এটা আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। যথা اَلْحَمْدُ–الرَّحْمٰنْ

(ক) আগের শব্দের সাথে হামজাতুল ওয়াসল মিলিয়ে পড়া যায় না।

(খ) আয়াতের শুরুতে আলিফ খালি থাকে। এই আলিফকে হারাকাহ দিয়ে (যের- যবর-পেশ) পড়তে হয়। যথা- اَلْدِّيْنَ الرَّحِيْمُ

(১) হামযাতুল ওয়াসলের পরের অক্ষর (ل) লাম হলে ইহাকে যবর দিয়ে পড়তে হয়।

যথাঃ اَلْحَمْدُ

(২) হামজাতুল ওয়াসলের পরের অক্ষর (ل) লাম না হলে তখন যবরের উচ্চারণ করা যাবেনা। সেখানে (৩য়) তৃতীয় হরফ দেখতে হবে। যদি তৃতীয় হরফের উপর যবর থাকে সে যবরকে বাদ দিয়ে যের দিয়ে পড়তে হয়। যথা- اِرْجِعِيْ

এখানে হামযাতুল ওয়াসল যদি ১নং হরফ ধরা হয়, তা হলে দ্বিতীয় হরফটি (ل) লাম নয় (র) ر এবং তৃতীয় হরফটি ج জীম।

(৩) তৃতীয় অক্ষরে যের হলে, যের দিয়ে পড়তে হয়।

(৪) তৃতীয় অক্ষরে পেশ হলে, পেশ দিয়ে পড়তে হয়।

১৯. আল ال পড়ার নিয়ম

আরবী শব্দকে অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ থেকে নির্দিষ্ট বাচক শব্দ করার একটি নিয়ম আছে। শব্দের আগে আলিফ ও লাম যোগ করে আলিফে যবর ও লামে সুকুন দিয়ে ঐ শব্দটিকে নির্দিষ্ট করা হয়। যথা– بَيْتٌ – اَلْبَيْتُ আরবীতে দু'ধরণের হরফ রয়েছে ঃ

(১) **হুরূফে শামসিয়াঃ** সূর্য বা Sun letter এর হরফ ১৪টি- ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن হুরূফে শামসিয়ার পূর্বে ال (আল) হলে ل (লাম) পড়া যায় না। হুরূফে শামসিয়াকে তাশদীদ দিয়ে পড়তে হয়। যথা- الشَّمْسُ = شَمْسُ

(২) **হুরূফে ক্বামারিয়া ঃ** হরফ ১৪টি- ب ج ح ع غ ف ق ك م و ء ه ي

* আল اَل যখন হুরুফে ক্বামারিয়ার পূর্বে হয়, তখন আলিফে যবর ও লামে ছাকিন দিয়ে পড়তেহয়। যথা- قَمَرُ اَلْقَمَرُ

হুরূফে ক্বামারিয়া Letter এ, আলিফ পড়তে হয় না, কিন্তু আলিফ লেখা থাকে যথা ঃ وَالْاَرْضُ

২০. ওয়াকফ্-এর বিবরণ

○..... **ওয়াক্ফের চিহ্নসমূহ ঃ-** (ওয়াকফ্ অর্থ থামা বিরাম চিহ্ন)

কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময় কোথায় কীভাবে থামতে হবে। আর কোথায় থামা যাবে না। তা বুঝবার জন্য কুরআন মাজীদে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন দেওয়া আছে। নিম্নে চিহ্নগুলোর তালিকা দেওয়া হলো–

○ ঃ এখানে আয়াত শেষ, এখানে থামতে হবে।

م ঃ এটা ওয়াক্বফে লাজিমের চিহ্ন। এখানে থামা আবশ্যক/জরুরী।

ط ঃ ইহা ওয়াক্বফে মুত্বলাকের চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।

ج ঃ এই চিহ্নে থামা ভালো।

ز ঃ এই চিহ্নে থামার অনুমতি আছে।

ص ঃ এই চিহ্নে থামিবে না।

صلى ঃ এই চিহ্নে মিলাইয়া পড়া উত্তম।

ق ঃ এই চিহ্নে থামা উচিৎ।

قف ঃ এই চিহ্নে মিলানো উত্তম।

قف ঃ এই চিহ্নে থামার আদেশ, অতএব এখানে থামা ভালো।

سكتة ঃ এই চিহ্নকে সাক্তা বলে। এই স্থানে নিঃশ্বাস জারী রেখে আওয়াজকে বন্ধ করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقفه ঃ এই চিহ্নকে সাক্তার ন্যায় পড়তে হয়।

لا ঃ এই চিহ্নে থামা যাবে না, কিন্তু গোল চিহ্নের উপরে আসলে থামা জায়েয।

مع : ঃ এই চিহ্নকে মুআনাক্বা বলে, পরপর দুই জায়গায় আসে, একটিতে থামতে হয়, অপরটিতে মিলিয়ে পড়তে হয়।

(صـ) وقف النبى صلى الله عليه وسلم ঃ এইরূপ চিহ্ন থাকলে ওয়াক্বফ করা মুস্তাহাব।

غـ وقف غفران ঃ এইরূপ চিহ্ন থাকলে ওয়াক্বফ করা উত্তম।

ঃ এই চিহ্নকে গোল চিহ্নের ন্যায় পড়তে হয়।

কুরআন মাজীদে এ ছাড়াও আরো অনেক বিরতি চিহ্ন আছে। তা শিক্ষকের কাছে থেকে বুঝে নিবেন।

নিঃশ্বাস অকুলান হলে চিহ্নিত স্থান ব্যতীত বিরতি লওয়াকে ওয়াক্বফ ইজতিরারী বলে। ওয়াক্বফে ইজতিরারী করলে এক দুই শব্দ পূর্ব হতে দোহরাইয়া পড়তে হয়।

ওয়াক্বফ হালাতে ◌ٰ খাড়া যের, ◌ٗ উল্টো পেশ পাওয়া গেলে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে না।

* **সাকতাহ ঃ** (কাটা বা বিচ্ছিন্ন আওয়াজ)

নিঃশ্বাসকে ভিতরে জারী রাখিয়া আওয়াজকে এক আলিফ পরিমাণ বন্ধ করে, আবার পুণরায় ঐ আওয়াজে পড়বার নাম সাকতাহ- যেমন– (র-কিন) رَاقٍ

* **মুয়ানাকা চিহ্ন ঃ** ۛ - ۛ ওয়াকফ অবস্থায় পর পর দুই স্থানে তিন নক্‌তা ওয়ালা চিহ্ন ۛط - ۛج হরফের উপর পাওয়া গেলে এক স্থানে Continuas করে পরবর্তী চিহ্নে থামতে হয়। যথা- সূরা বাকারা নং আয়াত।

২১. আলিফে মাকসূরা

ওয়াকফ (হাওলতে) অবস্থায় খালী (ي) ইয়া পাওয়া গেলে তার ডানে যবর বা ◌ٰ খাড়া যবর থাকলে তখন ইহাকে পরিবর্তন করে আলিফে রূপান্তরিত করে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। একে আলিফে মাকসূরা বলে। যেমন– فَتَرْضٰى – وَاسْتَغْنٰى – وَاتَّقٰى

২২. 'আনা' শব্দ (اَنَا) পড়ার নিয়ম

পবিত্র কুরআনে ৪ চার স্থান ব্যতীত বাকী স্থানে اَنَا টানা নিষেধ। স্থানগুলোর আয়াত হচ্ছে–

(১)	সূরা লোকমান ১৫ নং আয়াত	اَنَابَ	আনা-বা
(২)	সূরা যুমার আয়াত ১৭ নং আয়াত	اَنَابُوْ	আনা-বু
(৩)	সূরা আল ইমরান ১১৯ নং আয়াত	اَنَامِلَ	আনা-মিলা
(৪)	সূরা আল ফুরকারন ৪৯ নং আয়াত	اَنَاسِيَّ	আনা-সিয়া

এই ৪ اَنَا বাদে বাকী اَنَا টানা মানা।

২৩. সিফাত পড়ার নিয়মাবলী

সিফাত শব্দের অর্থ হরফের স্বভাব বা গুণ। আরবী ২৯টি হরফ উচ্চারণকালে শ্বাস জারী থাকা- বন্ধ হওয়া, নরম, শক্ত, কঠিন আওয়াজ, জিহ্বার আগা, মাঝখান, গোড়া, নাকের বাঁশী দীর্ঘ শ্বাস এ ধরনের বিভিন্ন গুণ গুলোকে হরফের সিফাত বলে।

সিফাত ২ প্রকার	
(১)	(২)
সিফাতে লাজিমাহ বা জাতিয়্যাহ	আরিজিয়্যাহ বা মুজাইয়্যানাহ

(১) সিফাতে লাজিমাহ ঃ যা আদায় না হলে মাখরাজ পূর্ণভাবে আদায় হয় না। উচ্চারণে পরিবর্তন আসে।

(২) সিফাতে আরিজিয়্যাহ বা মুজাইয়্যানাহ ঃ যে সিফাত আদায় না করলে মাখরাজ আদায় হয়ে যায় এবং হরফের উচ্চারণের পরিবর্তন আসে না, কিন্তু সৌন্দার্য নষ্ট হয়।

সিফাত লাজিমাহ আবার ২ প্রকার	
(১)	(২)
সিফাতে মুতাজাদ্দাহ	গাইরে মুতাজাদ্দাহ

(১) সিফাতে মুতাজাদ্দাহ আবার ১০ প্রকার-
(১) হামস (২) জিহির (৩) শিদ্দাত (৪) রিখওয়াহ (৫) ইস্তিলা (৬) ইস্তিফাল (৭) ইত্বাক (৮) ইনফিতাহ (৯) ইজলাক (১০) ইসমাত।

(২) সিফাতে গায়রে মুতাজাদ্দাহ ৮ প্রকার-
(১) সফীর (২) ক্বলকলা (৩) তাকরার (৪) তাফাশশী (৫) ইস্তিতালাত (৬) ইনহিরাক (৭) লীন (৮) গুন্নাহ।

২৪. সিফাতে মুতাজাদ্দাহ ১০ প্রকারের ব্যাখ্যা

(১) হামস ঃ অর্থ নরম। উচ্চারণে নরম এবং শ্বাস জারি থাকে বা বাতাস চালু থাকবে। এর হরফকে মাহ্সুমাহ বলে। হরফ ১০টি ف ح ث ه ش خ ص س ك ت

(একত্রফাহাছছু -শাখচুন-সাকাতা) فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ

(২) জিহির ঃ অর্থ উচ্চ আওয়াজ বন্ধ থাকবে। হরফ ১৯টি। এর হরফকে মাজহুরাহ বলে। যথা–

ا ء ب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ي

(৩) **শিদ্দাহ ঃ** অর্থ কঠিন। এর সাকিন বা ইদগামকালে মাখরাজের স্থানে আওয়াজ কঠিনভাবে বন্ধ হয়ে শ্বাসকে আটক করে দেয়। এর হরফকে শাদীদাহ বলে। হরফ ৮টি।

যথাঃ ء ج د ق ط ب ك ت

اَجِدُّ قُطٌّ بَكَتْ

(৪) **রিখওয়াহ্ ঃ** অর্থ সমান্য জারি হওয়া। এর সাকিন কালে মাখরাজের স্থানে আওয়াজ একেবারে বন্ধ না হওয়া; সামান্য রূপে জারি হতে থাকে। এদেরকে রিখওয়ার হরফ বলে। হরফ ১৬টি।

যথাঃ- ا ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ ع ف و ه ي

মুতাওয়াস্‌সিত্বাহ ঃ এর হরফ ৫টি যথা- ر م غ ن ل(লান্ গুমারা); আওয়াজ পুরোপুরি বন্ধ বা চালু হবে না। না নরম না শক্ত মধ্যম ধরনের হবে।

(৫) **মুস্তানিয়া অর্থ ঃ** বুলন্দ (উচ্চ) হওয়া। এর হরফকে মুস্তালিয়াহ বলে। উচ্চারণকালে জিহ্বার প্রায় অংশ উপরের তালুর দিকে উঠে যায়। হরফ ৭টি। যথা- خ ص ض غ ط ق ظ

একত্র করলে, খুচ্চা- দ্বাগত্বিন-ক্বিজ। خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

(৬) **ইস্তিফাল ঃ** অর্থ নীচু হওয়া। উচ্চারণকালে জিহ্বার কোনো অংশ তালুর দিকে না উঠে নীচের দিকে ঝুকে যায়। এই প্রকার হরফগুলিকে মুস্তাফিলাহ বলে। হরফ ২২টি।

ا ء ب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ي

(৭) **ইত্ববাক্ব ঃ** উচ্চারণ কালে জিহ্বার প্রায় অংশ উপরের তালুর সাথে মিলিত হয়ে তালুকে ঢেকে রাখে। এর হরফকে মুতবাক্বাহ্ বলে। হরফ- ৪টি। ص ض ط ظ

(৮) **ইনফিতাহ্ ঃ** অর্থ প্রশস্ত হওয়া। উচ্চারণ কালে জিহ্বা তালুর সাথে লাগিয়ে মধ্যস্থল প্রশস্তভাবে উচ্চারিত হয়। এই প্রকারের হরফকে মুন্‌ফাতিহাহ্ বলে। উপরের ৪টি বাদে বাকী ২৫টি মুনফাতিহার হরফ।

ا ء ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي

(৯) **ইজলাক ঃ** অর্থ তাড়াতাড়ি পূর্ণ বা শেষ হওয়া। উচ্চারণ ঠোঁট বা জিহ্বার কিনারা হতে তাড়াতাড়ি হয়। এই প্রকার হরফকে মুজলাক্বাহ বলে। হরফ ৬টি। যথা- ف ر م ن ل ب (ফারামান- লূব্বা)

(১০) **ইসমাত** ঃ হরফকে মাখরাজের স্থানে সঠিকভাবে স্থির/ বন্ধ করে পড়া। এই প্রকারের হরফকে মুসমাতাহ্ বলে। হরফ ২৩টি।

ا ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ق ك و ه ء ي

* সিফাতে গায়রে মুতাজাদ্দাহ

(১) **সফীর** ঃ চড়ুই পাখির শব্দকে সফীর বলে। অর্থাৎ যে হরফগুলো উচ্চারণ করার সময় চড়ুই পাখির আওয়াজের মত শক্তভাবে শব্দ উচ্চারিত হয়, এ ধরনের হরফগুলোকে হুরূফে সফীরাহ বলে। হরফ ৩টি। যথা- ص س ز

(২) قلقله ঃ **কলক্বালাহ** ঃ অর্থ লাফিয়ে বা নড়িয়ে উঠার সময় যে আওয়াজ প্রকাশ পায়। একেই ক্বলক্বলাহ বলে। ক্বলকলাহর হরফ ৫টি। ق ط ب ج د

(৩) تكرار **তাকরার** ঃ সিফতে তাকরার অর্থ একাধিকবার উচ্চারণ হওয়া। ر হরফটি সাকিন কিংবা তাশদীদ এবং ওয়াক্বফ অবস্থায় উচ্চারণকালে জিহ্বা কাপতে থাকে। সুতরাং একটি রা, এর স্থানে দু'টি রা এর উচ্চারণ করা হয়।

(৪) تفشى ঃ **তাফাশ্শী** ঃ এর অর্থ হুইসেলের ন্যায় শব্দ হওয়া। ش হরফটি উচ্চারণকালে জিহ্বা এবং তালুর মধ্যস্থলে হতে সম্মুখ দিকে হুইসেলের ন্যায় ছড়িয়ে শব্দ বাহির হওয়াকে তাফাশ্শী বলে।

(৫) انحراف ঃ **ইনহিরাফ** ঃ অর্থ ফিরে যাওয়া এবং এদের উচ্চারণকালে মাখরাজের স্থান হতে আওয়াজ ফিরে যায়। কিন্তু হরফ যুক্ত অবস্থার চেয়ে সাকিন অবস্থায় এটা পূর্ণভাবে অনুভূত হয়। হরফ-২টি। যথা- ر ل

(৬) استطالت ঃ **ইস্তিত্বলাত** ঃ অর্থ দীর্ঘ হওয়া। ض হরফটি উচ্চারণকালে তার মাখরাজ অন্য হরফের তুলনায় আওয়াজ দীর্ঘ হবে।

(৭) لين ঃ **লীন** ঃ অর্থ নরম ও তাড়াতাড়ি/কখনো মাদ্দ করে পড়তে হয়। যবরের বাম পার্শ্বে জযম ওয়ালা ইয়া ও ওয়াও হলে। যথাঃ بَوْ ؛ بَيْ ؛ خَوْف/ صَيْفَ

(৮) غنه ঃ **গুন্নাহ** ঃ গুন্নাহ অর্থ নাঁকা আওয়াজ। নূন এবং মীম যখন গোপন এবং তাশদীদ যুক্ত অবস্থার সন্ধি হয়। তখন এরা নিজ নিজ মাখরাজের অতি সামান্য হওয়া মাত্রই নাসিকা মূলে গোপন হয়ে পড়ে এবং একটা নাঁকা আওয়াজ বাহির হয়। এই নাঁকা আওয়াজটি এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যথাঃ اِنّ ، اِمَّ

২৫. হরফ দিয়ে শব্দ তৈরি করার উদাহরণ

أَ	أَخَذَ	سَأَلَ	دَرَأَ
بَ	بَسَطَ	عَبَدَ	كَتَبَ
تَ	تَرَكَ	فَتَحَ	بَهَتَ
ثَ	ثَلَبَ	مَثَلَ	بَحَثَ
جَ	جَعَلَ	سَجَدَ	خَرَجَ
حَ	حَمِدَ	لَهَمَ	فَتَحَ
خَ	خَلَعَ	بَخَعَ	سَلَخَ
دَ	دَمَعَ	صَمَدَ	فَسَدَ
ذَ	ذَكَرَ	كَذَبَ	تَبَذَ
رَ	رَفَعَ	عَرَضَ	عَصَرَ
زَ	زَرَعَ	نَزَعَ	لَمَزَ
سَ	سَكَنَ	كَسَبَ	عَبَسَ
شَ	شَفَعَ	كَشَفَ	خَمَشَ
صَ	صَرَعَ	نَصَحَ	نَكَصَ

ضَ	ضَرَعَ	حَضَر	رَفَعَ
طَ	طَرَحَ	خَطَرَ	وَسَطَ
ظَ	ظَعَنَ	نَظَرَ	وَعَظَ
عَ	عَقَدَ	فَعَلَ	جَمَعَ
غَ	غَرَسَ	شَغَلَ	بَلَغَ
فَ	فَقَدَ	نَغَعَ	عَطَفَ
قَ	قَصَدَ	سَقَطَ	خَلَقَ
كَ	كَتَمَ	سَكَبَ	مَسَكَ
لَ	لَمَسَ	خَلَفَ	فَصَلَ
مَ	مَرَجَ	حَمَلَ	حَكَمَ
نَ	نَشَأَ	مَنَعَ	وَزَنَ
وَ	وَقَعَ	عَوَرَ	
هَ	هَزَمَ	نَهَجَ	أَلَهَ
يَ	يَنَعَ		

পাঠকবৃন্দ প্রত্যহ একবার করে আযান ও ইক্বামাত শিক্ষা ছহীহ করার ব্যাপারে পড়া ও চর্চা করা যেতে পারে।

২৬. আযান ও ইক্বামাতের মাধ্যমে উদাহরণ/ব্যবহারিক প্রয়োগ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ،
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ এর পর বলতে হবে
اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
ইক্বামাতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ এরপর বলতে হবে
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
গোল তা (ة) এর উপর ওয়াক্ফ করিলে হা (ه) উচ্চারিত হয়

২৭. অর্থসহ ১০টি সূরা ঃ সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফীল পর্যন্ত

মক্কী সূরা **সূরা ফাতিহা** আয়াত -৭

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾
সমস্ত প্রশংসা	আল্লাহর জন্য	রব	সারা জাহানের	অশেষ মেহেরবান	পরম দয়ালু
مٰلِكِ	يَوْمِ	الدِّيْنِ ﴿٣﴾	اِيَّاكَ	نَعْبُدُ	وَاِيَّاكَ
মালিক	দিনের	বিচার	একমাত্র তোমারই	আমরা ইবাদত করি	একমাত্র তোমারই এবং
نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾	اِهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾	صِرَاطَ	الَّذِيْنَ
সাহায্য চাই	আমাদেরকে দেখিয়ে দাও	পথটি	সরল ও সঠিক	পথ	তাদের
اَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾	غَيْرِ	الْمَغْضُوْبِ	عَلَيْهِمْ	وَ	لَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾
তুমি অনুগ্রহ করেছো	যাদের উপর	নয়	অভিশাপ দেয়া হয়েছে	যাদের উপর	এবং	পথভ্রষ্ট

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের রব। (২) যিনি পরম দয়ালু অশেষ মেহেরবান। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। (৫) তুমি আমাদের সরল ও সঠিক পথটি দেখিয়ে দাও। (৬) তাদের পথ, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

মক্কী সূরা **সূরা নাস** আয়াত -৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	النَّاسِ ۙ﴿١﴾	مَلِكِ	النَّاسِ ۙ﴿٢﴾	اِلٰهِ
বলুন	আমি আশ্রয় চাই	রবের নিকট	মানুষের	বাদশার নিকট	মানুষের	মা'বুদের নিকট
مِنْ شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾	الَّذِىْ	يُوَسْوِسُ	فِىْ	النَّاسِ ۙ﴿٣﴾
ক্ষতি থেকে	কুমন্ত্রণাদান কারীর	গা ঢাকা দেয়	যে	কুমন্ত্রণা দেয়	মধ্যে	মানুষের
مِنَ	النَّاسِ ۙ﴿٥﴾	صُدُوْرِ				
থেকে	মানুষের	অন্তরের				
الْجِنَّةِ	وَالنَّاسِ ۧ﴿٦﴾					
জ্বিনদের	মানুষের এবং					

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) (হে নবী) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই- মানুষের রবের কাছে। (২) (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (আসল) বাদশার কাছে। (৩) (আমি আশ্রয় চাই) মানুষের (একমাত্র) মা'বুদের কাছে। (৪) (আমি আশ্রয় চাই) কুমন্ত্রণাদানকারীর ক্ষতি থেকে যে গা ঢাকা দেয়। (৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। (৬) জ্বিনদের মধ্যে থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে হোক।

মক্কী সূরা **সূরা ফালাক** আয়াত -৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ	اَعُوْذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾	مِنْ	شَرِّ	مَاخَلَقَ ۙ﴿٢﴾
বলুন	আমি আশ্রয় চাই	রবের নিকট	উজ্জল প্রভাতের	থেকে	ক্ষতি	সৃষ্টি করেছেন যা

فِي	النَّفّٰثٰتِ	وَمِنْ شَرِّ	اِذَا وَقَبَ ۝٣	غَاسِقٍ	شَرِّ	وَمِنْ
মধ্যে	ফুকদানকারীদের	ক্ষতি থেকে এবং	ছেয়ে যায় যখন	রাতের অন্ধকার	ক্ষতি	থেকে এবং

حَسَدَ ۝٥	اِذَا	حَاسِدٍ	شَرِّ	مِنْ	وَ	الْعُقَدِ ۝٤
হিংসা করে	যখন	হিংসুকের	ক্ষতি	থেকে	এবং	গিরায়

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) (হে নবী) আপনি বলুন, আমি উজ্জল প্রভাতের রবের নিকট আশ্রয় চাই (২) তাঁর সৃষ্টি করা (সকল জিনিসের) ক্ষতি থেকে (৩) আমি আশ্রয় চাই রাতের অন্ধকারের ক্ষতি থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়। (৪) এবং (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁকদানকারীদের ক্ষতি থেকে। (৫) হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে, যখন সে হিংসা করে।

মক্কী সূরা **সূরা ইখলাছ** **আয়াত -৪**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَلِدْ ۙ	لَمْ	الصَّمَدُ ۝٢	اَللّٰهُ	اَحَدٌ ۝١	اللّٰهُ	هُوَ	قُلْ
তিনি জন্ম দেন	নি	মুখাপেক্ষী নন	আল্লাহ	একক	আল্লাহ	তিনিই	বলুন

اَحَدٌ ۝٤	كُفُوًا	لَّهٗ	يَكُنْ	وَلَمْ	يُوْلَدْ ۝٣	لَمْ	وَ
কেউ-ই	সমতুল্য	তাঁর	নেই	নি এবং	তাকেও কেহ জন্ম	দেয়নি	এবং

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) (হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ। তিনি এক অদ্বিতীয় (২) তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেন নি। (৪) তাঁর সমতুল্য আর কেউ-ই নাই।

মক্কী সূরা **সূরা লাহাব** আয়াত -৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ	يَدَآ	اَبِيْ	لَهَبٍ	وَّتَبَّ ۝١	مَآ اَغْنٰى	عَنْهُ	مَالُهٗ
ধ্বংস হোক	দুই হাত	আবু	লাহাবের	সে নিজেও এবং	কোন কাজে আসবে না	তার জন্য	তার ধন
وَ	مَا	كَسَبَ ۝٢	سَيَصْلٰى	نَارًا	ذَاتَ	لَهَبٍ ۝٣	وَّامْرَاَتُهٗ	حَمَّالَةَ
এবং	যা	আর-উপার্জন	শীঘ্রই প্রবেশ	আগুনে	শিখায়	এবং লেলিহান	তার স্ত্রী	বোঝা
الْحَطَبِ	ۚ فِيْ	جِيْدِهَا	حَبْلٌ	مِّنْ	مَّسَدٍ ۝٥			
জ্বালানী কাঠ	মধ্যে	তার গলায়	রশি	পাকানো	শক্ত করে			

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হয়ে যাক সে নিজেও (২) তার ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন তার কোন কাজে আসবে না। (৩) বরং সে অচিরেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রবেশ করবে। (৪) (সাথে থাকবে) জ্বালানী কাঠ বহনকারিনী তার স্ত্রীও (৫) তার গলায় খেজুর পাতার পাকানো শক্ত রশি থাকবে।

মক্কী সূরা **সূরা নাস্‌র** আয়াত -৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا	جَآءَ	نَصْرُ	اللّٰهِ	وَ	الْفَتْحُ ۝١	وَ	رَاَيْتَ
যখন	আসবে	সাহায্য	আল্লাহর	এবং	বিজয়	এবং	আপনি দেখবেন
النَّاسَ	يَدْخُلُوْنَ	فِيْ	دِيْنِ	اللّٰهِ	اَفْوَاجًا ۝٢	فَسَبِّحْ	
মানুষদের	প্রবেশ করছে	মধ্যে	দ্বীনের	আল্লাহর	দলে দলে	তাসবীহ পড়ুন	

	تَوَّابًا ۝٣	كَانَ	اِنَّهٗ	اسْتَغْفِرْهُ	وَ	رَبِّكَ	بِحَمْدِ
	তাওবা	কবুল করেন	নিশ্চয় তিনি	তার কাছে ক্ষমা চান	এবং	আপনার রবের	প্রশংসাসহ

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে (২) তখন আপনি দেখবেন মানুষেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। (৩) অতএব আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড়ুন এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুল করেন।

মক্কী সূরা **সূরা কাফিরুন** আয়াত -৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢	لَآ اَعْبُدُ	الْكٰفِرُوْنَ ۝١	يٰٓاَيُّهَا	قُلْ
তামরা যাদের ‡ ইবাদত করো	আমি ইবাদত করিনা	কাফেররা	ও হে	বলুন
وَلَآ اَنَا	مَّآ اَعْبُدُ ۝٣	عٰبِدُوْنَ	اَنْتُمْ	وَلَآ
আমি নই এবং	আমি যার ইবাদত করি	ইবাদতকারী	তোমরা	নও এবং
مَآ اَعْبُدُ ۝٥	عٰبِدُوْنَ	وَلَآ اَنْتُمْ	مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤	عَابِدٌ
আমি ইবাদত করি যার	ইবাদতকারী	তোমরা নও এবং	তোমরা ইবাদত করো যাদের	ইবাদতকারী
	دِيْنِ ۝٦	وَلِيَ	دِيْنُكُمْ	لَكُمْ
	আমার দ্বীন	আমার জন্য এবং	তোমাদের দ্বীন	তোমাদের জন্য

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) (হে নবী) আপনি বলে দিন, ওহে কাফেররা। (২) আমি তাদের ইবাদত করিনা; তোমরা যাদের ইবাদত কর। (৩) আর তোমরা ইবাদত করোনা; আমি যার ইবাদত করি। (৪) এবং আমি ইবাদত করবো না; তোমরা যাদের ইবাদত কর। (৫) আর তোমরা ইবাদত কর না, আমি যার ইবাদত করি। (৬) অতএব তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আমার দ্বীন আমার জন্য।

মক্কী সূরা **সূরা কাওছার** আয়াত -৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اِنَّآ	اَعۡطَيۡنٰكَ	الۡكَوۡثَرَ ؕ﴿۱﴾	فَصَلِّ	لِرَبِّكَ
নিশ্চয়	আপনাকে দান করেছি	কাউছার	অতএব আপনি নামায পড়ুন	আপনার রবের জন্য
وَ	انۡحَرۡ ؕ﴿۲﴾	اِنَّ شَانِئَكَ	هُوَ	الۡاَبۡتَرُ ۚ﴿۳﴾
এবং	কুরবানী করুন	নিশ্চয় আপনার নিন্দুকরাই	সে	শিকড় কাটা

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) (হে নবী) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি। (২) অতএব, আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। (৩) নিশ্চই আপনার নিন্দুকেরাই শিকড় কাটা (অসহায়)।

মক্কী সূরা **সূরা মাউন** আয়াত -৭

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَرَءَيۡتَ	الَّذِىۡ	يُكَذِّبُ	بِالدِّيۡنِ ؕ﴿۱﴾	فَذٰلِكَ	الَّذِىۡ
আপনি কি দেখেছেন	যে	মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	শেষ বিচারকে	সেই ব্যক্তি	যে
يَدُعُّ	الۡيَتِيۡمَ ۙ﴿۲﴾	وَلَا يَحُضُّ	عَلٰى	طَعَامِ	الۡمِسۡكِيۡنِ ؕ﴿۳﴾	فَوَيۡلٌ
গলা ধাক্কা দেয়	এতিমকে	এবং উৎসাহ দেয় না	উপর	খাবার	মিসকিনদের	দুর্ভোগ
لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۴﴾	الَّذِيۡنَ	هُمۡ	عَنۡ	صَلَاتِهِمۡ	سَاهُوۡنَ ۙ﴿۵﴾	
নামাযির জন্য	যারা	তাদের	ব্যাপারে	তাহাদের নামাযের	উদাসীন	
الَّذِيۡنَ	هُمۡ	يُرَآءُوۡنَ ۙ﴿۶﴾	وَ	يَمۡنَعُوۡنَ	الۡمَاعُوۡنَ ۚ﴿۷﴾	
তারা	তাদের	দেখানোর জন্যেই করে	এবং	বারণ করে	প্রয়োজনীয় জিনিস পাতি	

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) আপনি কি সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছেন, যে শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করে। (২) এতো হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়। (৩) এবং মিসকিনদেরকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না। (৪) দুর্ভোগ! সেই (মুনাফিক) নামাযির জন্য। (৫) যারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন থাকে। (৬) যারা তাদের কাজকর্ম দেখানোর জন্যেই করে। (৭) এবং প্রয়োজনীয় জিনিস (অন্যদের) দিতে বারণ করে।

মক্কী সূরা **সূরা কুরাইশ** **আয়াত -৪**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

	الشِّتَآءِ	رِحۡلَةَ	اٖلٰفِهِمۡ	قُرَیۡشٍ ۝١	لِاِیۡلٰفِ
	শীতকাল	সফরের জন্য	তাদের প্রতিরক্ষা	কুরাইশ বংশের	প্রতিরক্ষার জন্য
الَّذِیۡ	الۡبَیۡتِ ۝٣	هٰذَا	رَبَّ	فَلۡیَعۡبُدُوۡا	وَالصَّیۡفِ ۝٢
যিনি	ঘরের	এই	রবের	ইবাদত করা উচিত	গরমকালের ও
خَوۡفٍ ۝٤	مِّنۡ	وَّاٰمَنَهُمۡ	جُوۡعٍ	مِّنۡ	اَطۡعَمَهُمۡ
ভয়-ভীতি	থেকে	তাদের নিরাপদ করেছেন	ক্ষুধায়	হতে	তাদের খাবার দিয়েছেন

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) কুরাইশ বংশের প্রতিরক্ষার জন্য। (২) তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরম কালের সফরের জন্য। (৩) অতএব তাদের এই ঘরের রবেরই ইবাদত করা উচিত। (৪) যিনি ক্ষুধায় তাদের খাবার দিয়েছেন এবং তাদের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ করেছেন।

মক্কী সূরা **সূরা ফীল** আয়াত -৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلَمۡ	الۡفِيۡلِ ۝١	بِاَصۡحٰبِ	رَبُّكَ	فَعَلَ	كَيۡفَ	تَرَ	اَلَمۡ
নি	হাতি	ওয়ালাদের সাথে	আপনার রব	করেছেন	কেমন	দেখেননি	আপনি কি
طَيۡرًا	عَلَيۡهِمۡ	اَرۡسَلَ	وَّ	تَضۡلِيۡلٍ ۝٢	فِىۡ	كَيۡدَهُمۡ	يَجۡعَلۡ
পাখি	তাদের উপর	তিনি পাঠিয়েছেন	এবং	বানচাল	মধ্যে	তাদের ষড়যন্ত্র	তিনি কি করেন
مَّاۡكُوۡلٍ ۝٥	كَعَصۡفٍ	فَجَعَلَهُمۡ	مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۝٤	بِحِجَارَةٍ	تَرۡمِيۡهِمۡ	اَبَابِيۡلَ ۝٣	
জাবর কাটা/খেয়ে ফেলা	ঘাসের মত	ফলে তারা হয়ে গেল	আগুনে পোড়ানো	পাথর	তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল	ঝাঁকে ঝাঁকে	

পরম করুণাময় অশেষ মেহেরবান আল্লাহর নামে

(১) আপনি কি দেখেননি! আপনার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন! (২) তিনি কি তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেননি! (৩) তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। (৪) তারা তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল। (৫) ফলে তাদেরকে পশুর জাবর কাটা ঘাসের মত করে দিলেন।

২৮. আরবীতে ১২ মাসের নাম

ক্রমিক নং		বাংলা	আরবী	বাংলা	ইংরেজি
1	১	মুহাররম	مُحَرَّمُ	বৈশাখ	January
2	২	ছফর	صَفَرُ	জৈষ্ঠ্য	February
3	৩	রবিউল আউয়াল	رَبِيْعُ اَلْاَوَّلُ	আষাঢ়	March
4	৪	রবিউস সানি	رَبِيْعُ اَلثَّانِيْ	শ্রাবণ	April
5	৫	জামাদিউল আউয়াল	جَمَادَى اَلْاَوَّلُ	ভাদ্র	May
6	৬	জামাদিউস সানি	جَمَادَى اَلثَّانِيْ	আশ্বিন	June
7	৭	রজব	رَجَبُ	কার্তিক	July
8	৮	শাবান	شَعْبَانُ	অগ্রহায়ণ	August
9	৯	রমাদান	رَمَضَانُ	পৌষ	September
10	১০	শাওয়াল	شُوَّالُ	মাঘ	October
11	১১	জিলক্বদ	ذِوُ الْقَعْدَةُ	ফাগুন	November
12	১২	জিলহজ্জ	ذِوُ الْجَجَّةُ	চৈত্র	December

২৯. আরবীতে ৭দিনের নাম

ক্রমিক নং		বাংলা	আরবী	বাংলা	ইংরেজি
1	১	ইয়াওমুল আহাদ	يَوْمُ الاَحَدِ	রবিবার	Sunday
2	২	ইয়াওমুল ইসনাইন	يَوْمُ اِلاِثْنَيْنِ	সোমবার	Monday
3	৩	ইয়াওমুছ ছুলাছিই	يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ	মঙ্গলবার	Tuesday
4	৪	ইয়াওমুল আরবা-ই	يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ	বুধবার	Wednesday

ক্রমিক নং		বাংলা	আরবী	বাংলা	ইংরেজি
5	৫	ইয়াওমুল খামিছ	يَوْمُ الْخَمِيْسِ	বৃহস্পতিবার	Thursday
6	৬	ইয়াওমুল জুমুআ	يَومُ الجُمُعَةِ	শুক্রবার	Friday
7	৭	ইয়াওমুল সাবতি	يَوْمِ السَّبْتِ	শনিবার	Saturday

৩০. আরবীতে সংখ্যা

ক্রমিক নং		বাংলা	আরবী	বাংলা	ইংরেজি
1	১	ওয়াহেদ	وَاحِدٌ	এক	One
2	২	ইসনান	اِثْنَانِ	দুই	Two
3	৩	ছালাছা	ثَلَاثَةٌ	তিন	Three
4	৪	আরবাআ	اَرْبَعَةٌ	চার	Four
5	৫	খামছা	خَمْسَةٌ	পাঁচ	Five
6	৬	সিত্তাহ	سِتَّةٌ	ছয়	Six
7	৭	সাবআ	سَبْعَةٌ	সাত	Seven
8	৮	ছামানিয়া	ثَمَانِيَةٌ	আট	Eight
9	৯	তিছআ	تِسْعَةٌ	নয়	Nine
10	১০	আশারা	عَشَرَةٌ	দশ	Ten

৩১. কথা বলার আদব ও মাধুর্য

কথা বার্তা বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। কথা বলা হলো একটা আর্ট বা কলা-কৌশল। যার মাধ্যমে মানুষ মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন উত্তম ভাবে মানুষের সাথে কথা বলে। উত্তমভাবে কথা বলা একটি ইবাদত। কথা বলতে হবে আল্লাহর নামে, আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং মানুষের কল্যাণ কামনায়। উত্তম কথার উদাহরণ হলো একই বৃক্ষের ন্যায় যার ডালপালা সমস্ত আকাশ বিস্তৃত, শিকড় ভূমির অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষটি সারা বছর ফল দান করে। মানুষ তার ফল খায় ছায়া লাভ করে এবং আরো নানাবিধ কল্যাণ লাভ করে। মন্দ কথা হলো একটি ফলবিহীন কাটাযুক্ত বৃক্ষ। যার দ্বারা মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয় কোনো কল্যাণ তার মধ্যে নেই। তাই কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কথা যেন উত্তম কথা হয়। মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে বলেছেন যে "আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ যে তুমি মিষ্টভাষী। তুমি যদি রুক্ষ ভাষায় কথা বলতে মানুষ তোমার চারপাশ থেকে ছিটকে পড়তো।" আল্লাহ মুসা এবং হারুন আলাইহি সালামকেও ফেরাউনের মতো দাম্ভিক এবং অহংকারী ও পাপিষ্ট ব্যক্তির সাথেও বিনয় ও নম্র ভাষায় দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কথা হতে হবে পাণ্ডিত্য এবং দুর্বুদ্ধতা থেকে মুক্ত। সহজ-সরল ভাষায় বাহুল্য বর্জন করে, শ্রোতার ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হৃদয়গ্রাহী করে সংক্ষিপ্তভাবে শ্রোতার সামনে পেশ করতে হবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা হলে একাধিকবার আলোচনা করতে হবে। কথা দিয়ে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা, অবজ্ঞা প্রদর্শন করা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আন্দাজ অনুমানভিত্তিক কথা বলা, পরনিন্দা, গীবত চর্চা এবং অতীব উচ্চ শব্দে তথা তাম্ভিকতাপূর্ণ কথা বলা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন "কথা হবে সংক্ষিপ্ত আর নামাজ হবে দীর্ঘ।" সংক্ষিপ্ত ও সারমর্মপূর্ণ কথায় রয়েছে জাদুকরি প্রভাব। আল-কুরআন হচ্ছে আহসানুল হাদীস তথা সর্বোত্তম বাণী। এইজন্য কথা বলার সময় আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলা উচিত। আলোচ্য বিষয় হতে হবে নসিয়া পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

বক্তা যখন কথা বলবেন তখন শ্রবণকারীর চোখের দিকে লক্ষ্য করলে তিনি উপলব্ধি করত পারবেন শ্রোতার মনমানসিকতা এবং উক্ত কথার প্রভাব তার উপর ক্রিয়াশীল হচ্ছে কিনা। কথা বলার পূর্বে নিজের অক্ষমতা আল্লাহর কাছে তুলে ধরা, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, সর্বোপরি শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এমন কথা বলার তাওফিক কামনা করা।

৩২. খাওয়ার আদব

রাসূল (সা.) এর শিখানো পদ্ধতি ও খাবারের আদব কেমন ছিল? তা আমরা অনুসরণ করে চলবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সা.) প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে ডান দিক হতে খেতেন। তিনি খাবার সময় বেহুদা কথা বলতেন না। তিনি উত্তম খাবারগুলো সহযোগিদের মাঝে বিরতণ করে দিতেন। তিনি জীবনে কখনো পেট ভরে খেতেন না। সাহাবীদেরকে পেটে কিছু অংশ খালি রেখে খাবার খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি রুটিন ও নিয়মানুযায়ী খাবার খেতেন। তিনি কখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার খেতেন না। খাদ্য একটি নিয়ামত, বেশি খাওয়া কিয়ামত। তিনি ফ্রেস ও তাজা খাবার খাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতেন। জাংঙ্গ Jung food খাওয়া হতে আমরা নিজেরা বিরত থাকবো এবং আমাদের পরিবার ও সন্তানদেরকে Jung food হতে বিরত রাখব। আজকাল খাবারের কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যেমন- ক্যান্সার, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলেস্টরল, গ্যাস্টিক আলসার ইত্যাদি। এই রোগের কারণে মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে।

নিজকে সুস্থ্য রাখার জন্য রাসূল (সা.)-এর তরিকায় মাঝে মধ্যে রোজা রাখার চেষ্টা করব। রাসূল (সা.) সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। আইয়্যামে বীজের রোযা অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে খাবারের আদব রক্ষা করে চলার এবং সুস্থ্য অবস্থায় রোগ মুক্তভাবে বাঁচার তৌফিক দান করন। আমীন।

৩৩. মজলিসের আদব

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হওয়া কর্তব্য। বক্তার কথা মন দিয়ে শোনা ও বুঝার চেষ্টা করা। বক্তব্যের সারাংশ অনুধাবন করতে হবে। প্রশ্ন থাকলে হাত তুলে অনুমতি নিয়ে কথা বলা। মজলিসের ভিতর দিয়ে যেতে হলে নম্রভাবে, ভদ্রতার সাথে কারো শরীরে যেন পা স্পর্শ না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা। ত্রুটি হলে ক্ষমা চেয়ে Sorry বলা। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে পরিচালকের অনুমতি নিয়ে যাওয়া। কাউকে বিরক্ত না করার চেষ্টা করা। প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে মজলিস থেকে বাহিরে যাওয়া প্রতিটি ভদ্র ও বুদ্ধিমান মানুষের কাজ। এই সম্পর্কে সূরা লোকমানের ১৮নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে– আর মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না। পৃথিবীর বুকে চলো না উদ্ধত ভঙ্গিতে। আল্লাহ পছন্দ করেন না আত্মম্ভরী ও অহংকারীকে।

সূরা হুজরাতের ২ এবং ৩ নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে- "হে মু'মিনগণ! নিজেদের আওয়ায রাসূল (সা.)-এর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না। উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না। যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব নেক কাজ-কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। যারা আল্লাহর রসূল (সা.)-এর সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।"

মজলিসে অনেক সময় লোক সমাগম বেশি হলে অন্যদের জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। জায়গা প্রশস্ত করে দেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

হে মুমিনগণ তোমাদেরকে যখন বলা হয়, 'মজলিসে স্থান করে দাও'। তখন তোমরা স্থান করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দিবেন। আর যখন বলা হয় তোমরা উঠে যাও। তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে. আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর. আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (সূরা মুজাদালা আয়াত-১১)

৩৪. মসজিদের আদব

মসজিদ দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা, শান্তি ও নিরাপত্তার জায়গা। যেহেতু মসজিদ আল্লাহর ঘর। অতএব যারাই এই ঘরে ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবেন; তারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করবেন। যারা দুনিয়াতে মসজিদ বানাবে, মসজিদ আবাদ করবে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন; আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে উত্তম আবাস তৈরি করবেন। যারা মসজিদের খাদেম বা মোতোয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করবেন; তাদের কতিপয় মৌলিক গুণাবলী থাকা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰۗىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

"নিশ্চয় অল্লাহর মসজিদের আবাদকারী (মুতাওয়াল্লী ও খাদিম) হবে তারাই; যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় যে, তারা সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা তওবা-১৮)

وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَاۗءَهٗ ۭ اِنْ اَوْلِيَاۗؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে একমাত্র মোত্তাকীরা, কিন্তু অধিকাংশ লোক এই কথা জানেনা।" (সূরা আনফাল: ৩৪)

মসজিদে বসা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দোয়া এমনকি নিরবতা অবলম্বন অথবা নামাজের জন্য অপেক্ষা ইবাদতরত অবস্থার সমান। মসজিদে হলো নেকি অজনের সর্বোত্তম স্থান।

দোয়া পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। দু' রাকাত নামাজ পড়া ব্যতীত কোন অবস্থাতেই বসা উচিৎ নয়। এমনকি মসজিদে ইমাম সাহেব খুতবা দিতে থাকলে কিংবা ওয়াজরত অবস্থায় হলেও।

মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা সকলের ঈমানী দায়িত্ব। ইবাদত-বন্দেগী শেষে দোয়া পড়ে বাম পা দিয়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া সকল মুসল্লী ও মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

সুন্নাত থেকে বিরত রাখার জন্য মসজিদে লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখা ঠিক নয়। কেননা, ইক্বামত হয়ে গেলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামায়াতে যোগ দিলে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ সালাতের নেকী পেয়ে যাবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ থেকেই মহিলাগণ নিয়মিতভাবে পুরুষের সাথে জুমু'আর ও জামায়াতে যোগদান করতেন। তবে এজন্য পরিবেশ নিরাপদ ও অভিভাবেকের অনুমতি প্রয়োজন হবে। সুগন্ধিবিহীন অবস্থায় তাকে আসতে হবে। পৃথক দরজা, পৃথক কক্ষ বা পর্দা দ্বারা পৃথক ব্যবস্থাপনায়।

মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বছা ও মসজিদে নববী ব্যতীত সকল মসজিদ মর্যাদা সমান, তাই বেশি নেকী হবে মনে করে বড় মসজিদে যাওয়া উচিত নয়।

মসজিদে খুতবা ব্যতীত উঁচু স্বরে কথা বলা এবং শোরগোল করা যাবে না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৩৫. রাস্তায় ও যানবাহনের চলার আদব

সর্বদাই রাস্তায় ডান দিয়ে চলার অভ্যাস করতে হবে। কারণ তা সুন্নত। ময়লা পানি, কাদা, গর্ত সামনের দিকে দেখে চলতে হবে। কাউকে দেখলে সালাম দিবে, উচ্চস্বরে কথা বলা হতে বিরত থাকা। ঝগড়া বিবাদ মারামারি ও দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করা। বাসে ট্রেনে অসুস্থ্য ও বয়স্কদের শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে বসতে দেওয়া।

গর্ব-দাম্ভিকতার পদভারে চলাফেরার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ○

"আর জমীনে বড়াই করে চলো না। তুমি তো কখনই জমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না। এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।" (সূরা ইসরা- ৩৭)

অন্যের চলার বিঘ্ন ঘটিয়ে নিজের যাবার ব্যবস্থা করা, শোভাযাত্রা করা; যার মাধ্যমে গর্ব-অহংকার প্রকাশ পায়; তা এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। মূলকথা সর্বত্র চলাফেরার সময়ে বিনয় ও নম্রতা যেন প্রকাশ পায়।

৩৬. সময়ের মূল্য

وَ الۡعَصۡرِ ۙ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ۙ

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আল আসর)

উক্ত সূরার শুরুতে আল্লাহ সময়ের কসম করে মানুষকে তার হায়াতের প্রতিটি মুহূর্তকে কল্যানকর কাজে ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সময়কে মূল্য দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারে তারাই জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে। নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি কাজগুলি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা ফরয। ঠিক তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজ যেমন, লেখা-পড়া, চাকরি, ব্যবসায়, বিবাহশাদি ইত্যাদি কাজগুলো যথাসময়ে সম্পন্ন না করে হেলায় ফেলায় সময় কাটিয়ে দিলে শুধু আফসোস করা যাবে। কিন্তু আমরা কখনো অতীত কালে ফিরে যেতে পারব না। আল্লাহ আমাদেরকে যে নির্ধারিত হায়াত দিয়েছেন। সেই হায়াতে জিন্দেগীতে ঈমান আনার পর সৎ কাজ করা, সত্য কথা বলা এবং অন্যকে সত্যের উপর অটল ও অবিচল থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। মৃত্যুর পর জাহান্নামী হওয়ার পর যত আবেদন-নিবেদনই করা হউক না কেন তাকে আর দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হবেনা বলে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। কথায় বলে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। তাই আমাদেরকে সময় মতো ঘুমাতে যাওয়া, ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ইবাদত সহ দুনিয়ার যত কাজ আছে সেগুলোকে হালাল ও সুন্নাহ সম্মত উপায়ে সম্পাদন করতে হবে।

কৈশর ও যৌবনে যদি কেউ সময়ের গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা ও অলসতা করে ঠিকমতো লেখা-পড়া না করে, পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিয়ে ফাঁকিবাজি করে। তা হলে সে যেন নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারল। অর্থাৎ সে তার নিজের জীবনকে ধ্বংস করলো। আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ আমাদের বিচার করবেন। আমরা কেউ আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব না।

বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে যদি মনে করি আমি বুদ্ধিমান বা বাবা-মা আমার চালাকি ধরতে পারল না তারা বোকা। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আমরা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব না। অণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে আল্লাহ সেটার প্রতিদান দিবেন এবং অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে সেটার শাস্তিও আমাদেরকে পেতে হবে। তাই বুদ্ধিমান হলো সে, যে সময়ের গুরুত্ব দিয়ে সময়ের কাজ সময় মতো শেষ করে। আল্লাহর হুকুম মানে এবং পিতা মাতার আনুগত্য ও খেদমত করে। আল্লাহ আমাদেরকে সেই কথা বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

৩৭. ব্যায়াম (Exercise) ও পানির অপরিহার্যতা

আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মধ্যে সুস্থ্যতা অন্যতম নেয়ামত।

মানব জীবনের জন্য ব্যায়াম ও প্রচুর পানি পান করা একান্ত প্রয়োজন। যারা নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রচুর পরিমাণে পানি পান করে না, তাদের অনেকে বেশিরভাগ সময় অসুস্থ্য থাকে এবং জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

একজন মানুষকে তার শারীরিক সুস্থ্যতার জন্য দৈনিক রুটিন অনুযায়ী লিস্ট করে on time খাওয়া-ঘুম, সকাল-বিকাল হাটার অভ্যাস করা, শাক-সবজি আবাদ করা, খাওয়া, মসজিদে হেঁটে গিয়ে নামাজ পড়া বাগানে পানি দেয়া, ভালো আবহাওয়ায় থাকা নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলো খেলার মাধ্যমে অভ্যাসে পরিণত করা ও দুঃশ্চিন্তা হতে মুক্ত থাকা উত্তম।

নিজে ও পরিবারভুক্ত সবাই মিলে সাপ্তাহিক পরিবারিক মিটিং-এ ব্যায়ামের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করে সুখী পরিবার গড়ে তুলুন।

ব্যায়ামের মাধ্যম :

১। ফুটবল, ২। ভলিবল, ৩। হা-ডু-ডু, ৪। ক্রিকেট, ৫। ব্যাডমিন্টন, ৬। সাতার কাটা, ৭। দৌড়ানো, ৮। হাঁটা ইত্যাদি। উদাহরণ ১টি ছুরি দ্বারা কাজ করলে ছুরি ধারালো থাকে ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। আবার ছুরি ব্যবহার না করলে; সে ছুরিতে (বা চাকুতে) ঝং বা মরিচা ধরে অকেজো হয়ে যায়।

ঠিক তদ্রূপ মানুষের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে (কলকব্জার ন্যায়) সুস্থ্য রাখার জন্য দৈনিন্দিন ব্যায়ামের প্রয়োজন। এ ব্যায়াম নিয়মিত না করলে মানব দেহ বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মানুষ অসুস্থ বা অচল হয়ে পড়ে। যার ফলে ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে। ১। ডায়াবেটিক, ২। হাই প্রেশার, ৩। ব্লাড প্রেশার, ৪। হার্ট এটাক, ৫। মাথা ঘুরানী, ৬। চোখে ডবল দেখা, ৭। টিউমার ও ৮। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

আবার অনেকে পানি কম পান করার কারণে কিডনী অকেজো হয়ে পড়ে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশের অনেক সৌখিন ও (বিলাস বহুল) আরাম প্রিয় মানুষ সামান্য পথ না হেটে রিক্সায় চলাচল করে। সেলুনে গিয়ে নিজের শরীর ম্যাসাজ করায়। অনেকের শরীরের গঠন অনুযায়ী অনেক মোটা ও ওজন বেশি হওয়ার কারণে প্রায়ই অসুস্থ্য থাকেন।

ব্যায়াম করার কারণে ইউরোপ ও আমেরিকান লোকেরা অনেক সুস্থ থাকে। বাস্তবিক কারণে প্রত্যেক নর-নারীকে সুস্থ্য অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্যে দৈনিক ১ ঘন্টা ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করা আবশ্যক।

ওজন ও মেদভুড়ি কমিয়ে সুস্থ্য থাকার কিছু পদ্ধতি

১। প্রত্যহ সকালে খালি পেটে পানিতে আদা ও মেতি সিদ্ধ করে ঐ গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে নিয়মিত খাবেন। ব্লাড প্রেসার ও ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন।

২। চর্বি জাতীয়, তৈলাক্ত ও রেড মিট, মিষ্টি জাতীয় খাওয়া হতে বিরত থাকবেন। রুটিন করে সময় মত অল্প করে খাবেন।

৩। নিয়মিত শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ব্যায়াম করবেন এবং শাক-শব্জি বেশি করে খাবেন।

৪। নামায আদায় কালে ধীরস্থির ভাবে রুকু, সেজদা করবেন এবং সপ্তাহে সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং আইয়ামে বীজ (চন্দ্র মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখ) এর রোযা রাখলে সুফল পাবেন।

৩৮. দারস দেওয়ার পদ্ধতি

নিজেদের মাঝে ও সাধারণ মানুষের কাছে কুরআনকে সহজভাবে বুঝা ও বুঝানোর জন্যে, সহজ ও সরল ভাষায় ধীর স্থিরভাবে শ্রোতাদের আগ্রহ তৈরি করে দারস দেয়া প্রয়োজন। দারস দেয়ার অভ্যাস তৈরি করলে নিজের অজ্ঞতা দূর হয়। মুখের জড়তা কাটে, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
আসুন, আমরা কীভাবে দারস দিবো তার কিছু পদ্ধতি শিখে নেই:
তেলাওয়াত কুরআন ও হাদীস (১৫-২০ মিনিট ভাগ করে নিন)।

১. সরল অর্থ
২. সম্বোধন
৩. সূরার নামকরণ
৪. কোথায় কেন নাযিল (কখন)
৫. শানে নূযূল
৬. বিষয় বস্তু
৭. ব্যাখ্যা
৮. শিক্ষা
৯. ত্রুটির জন্য ক্ষমার আহবান

সম্বোধন

উপস্থিত আজকের প্রোগ্রামের পরিচালক ও দ্বীনি ভায়েরা, আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়ারাকাতুহু। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনের .....তম সূরার .... নং ..... আয়াত তেলাওয়াত ও সরল অর্থ পেশ করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দান করলে তার কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (দেয়ার) করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তৌফিকি ইল্লাবিল্লাহ। এরপর ধারাবাহিকভাবে নামকরণ, নাযিল হওয়ার সময়কাল ইত্যাদি বলতে হবে।

৩৯. খোতবা দেওয়ার পদ্ধতি

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি। আমরা তার সাহায্য চাই। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং আমরা নিজেদের অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের কাজের মন্দ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান। তাকে বিভ্রান্ত করার কেউ নেই। যে পথ ভ্রষ্ট হয় তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন পথ প্রদর্শক নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও রাসূল।"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

"হে ঈমানদানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যতটুকু ভয় করা উচিত। তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না।" (সূরা আল ইমরান-১০২)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তিনি তা থেকে জুড়ি পয়দা করে দিয়েছেন এবং তা হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্মান কর গর্ভধারিণী মাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তীক্ষ্ম-দৃষ্টি দাতা।" (সূরা নিসা-১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল। তা হলে তিনি সকল কাজ শুধরে দেবেন। তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহাসাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আহযাব-৭০-৭১)

উক্ত উদাহারণ ছাড়াও ইমাম সাহেবগণ সমকালীন ঘটনাবলী এবং পরবর্তী সপ্তাহে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আয়াত ও হাদিস পাঠ করে মুসুল্লিদেরকে নসিহা প্রদান করেন।

৪০. সালাম (اَلسَّلَامُ)

সালাম বিনিময় পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যম-

মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সালাম। সালাম দেয়া সুন্নাত। তবে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য মল-মূত্র ত্যাগ রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া মাকরূহ। দেখা-সাক্ষাতে, পরস্পর ভাব বিনিময়ে ও সম্ভাষণে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বাক্যটি এবং তার জবাব দান পরস্পরের জন্য দোয়া ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী। ছোট-বড়, আমীর-গরিব, সকলের ক্ষেত্রে এবং সব সময়ই প্রযোজ্য। এটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বিরাট নিয়ামত। অমুসলিমদের সাথে সাদর সম্ভাষণ জানাতে হবে। হাসি মুখে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে হবে।

সালাম দিয়ে গৃহে প্রবেশ করা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। আশা করা যায় যে, তোমরা এর প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে।" (২৪-সূরা আন নূর ঃ ২৭-৩১)

সালামের উত্তম জবাব দেয়া

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَسِيْبًا.

"আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া (সালাম) করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া (সালাম) কর, তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসেব গ্রহণকারী।" (সূরা আন নিসা : ৮৬)

আগে সালাম পরে কালাম (কথা)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ.

"জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, কথাবার্তা বলার আগেই সালাম করবে।" তিরমিযী ৫ম খণ্ড, অধ্যায় অনুমতি প্রার্থনা পৃঃ ১৪৪)।

ছোটরা বড়দের সালাম দেবে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "ছোটরা বড়দেরকে, হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।" (সহীহ বুখারী)

বড়রাও প্রয়োজনে (শিক্ষা দেয়ার জন্য) ছোটদের সালাম দেবে

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আল্লাহর রাসূল (সা.) একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন।" (বুখারী ৯ম খণ্ড, অঃ অনুমতি চাওয়া পৃঃ নং- ৫১৩)

গৃহে প্রবেশ করতে সালাম, বিদায় হতেও সালাম

عَنْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى اَهْلِهِ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهُ بِالسَّلاَمِ

কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন গৃহবাসীকে সালাম করবে। আর যখন বের হবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম করে বিদায় নিবে।" (বায়হাকী)

দ্বিতীয় খণ্ড

১. দাওয়াতে দ্বীনের কালিমাসমূহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য (মাবুদ) নাই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত দূত বা রাসূল।"

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

"হে আল্লাহ তোমার প্রশংসাসহ তোমার তাসবিহ পাঠ করছি। আর আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম সর্বোচ্চ মহান আল্লাহ ব্যতিত কারো কোনো ক্ষমতা নেই।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি এই সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।"

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ.

"আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, যেমনিভাবে তিনি তাঁর উত্তম নাম ও গুণাবলী দ্বারা বিরাজমান। আর আমি মেনে নিলাম তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে।"

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রাসূলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল ক্বাদরি খায়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'য়াছি বা'য়াদাল মাওত।

"আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আসা ভালোমন্দ ভাগ্যের প্রতি এবং মৃত্যুর পর উত্থানের প্রতি।"

২. ঈমান (اَلْاِيْمَانُ) কি ও তার ব্যাখ্যা

ঈমান (اَلْاِيْمَانُ) শব্দের অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নির্ভর করা ও অবনত হওয়া। ইসলামের যাবতীয় ইবাদত ও নেক আমলের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ইমাম গাযযালী (র) বলে, নবী করীম (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে। তবে সহজ কথা হলো কালিমায়ে তাইয়্যেবা এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মর্ম অন্তর দিয়ে মেনে নিয়ে মুখে উচ্চারণ ও কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাকেই ঈমান বলে। যেখানে আল্লাহকে একক সত্তা হিসেবে মেনে নেয়ার এবং নবী মুহাম্মদ (স.) কে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করার ঘোষণা রয়েছে। ঈমান ছাড়া কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো নেকী কবুল হবার নয়। পরকালে নাজাত পাওয়াও সম্ভব নয়। যে কোন আমল দেখতে যতই নেক মনে হোক না কেনো, যদি তার ঈমান না থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে তার কোনোই মূল্য নেই।

এ কারণেই ঈমানদারগণ ছাড়া যে যত বড়ই ভালো কাজ করুক না কেনো, যতই কষ্ট স্বীকার করুক না কেনো; আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্যই নেই। এ পরকালে এর জন্যে কোন প্রতিদানও তার জন্যে নেই। একথা আমরা দুনিয়ার জীবনেই বুঝতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একটা বিল্ডিং করে; আর তার ফাউন্ডেশন মজবুত করে নেয়, তবে উপরের দিকে যত ইচ্ছে তলা বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু ফাউন্ডেশন না থাকলে তার বিল্ডিং করা কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে। যদিও কোনো রকম ইট বালি দিয়ে একতলা দাঁড় করায়; তবে তা যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। এমন আশঙ্কায় সর্বদা টটস্থ থাকতে হবে। তেমনি ঈমান ছাড়া যত নেক আমলই করুক না কেনো; তা কোনো কাজে আসবে না।

মূলত ৭টি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মুখে বলাকে ঈমান আনা বলে। সাতটি বিষয় হচ্ছে–

اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

"আমি ঈমান এনেছি- ১. আল্লাহ, ২. আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতা, ৩. আল্লাহর পাঠানো কিতাব, ৪. রাসূলদের প্রতি, ৫. পরকালের প্রতি, ৬. আল্লাহর পক্ষ হতে ভালো-মন্দ তাকদীরের প্রতি এবং ৭. মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে তার উপর।"

উপরিউক্ত ৭টি বিষয়ের ১টি বিষয়ে ঈমানের সন্দেহ থাকলে, অথবা বিশ্বাস না থাকলে, পাক্কা ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঈমানের ৭টি বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে। আমাদের সমাজের অনেকের এ আকিদা যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। না, এটা বলা যাবে না। বরং আল্লাহ আরশে আযীমে সমাসীন। আরশে আযীম থেকে তিনি তাঁর কুদরতে অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টি জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঈমান আনার পর আজীবন যেনো মজবুত ঈমান সহকারে আমল করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ পথে অবিচল থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

"হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়ত দান করার পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না। তোমার ভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে রহমত প্রদান করো। নিশ্চয় তুমি প্রচুর প্রাদান কারী।" (সূরা আলে ইমরান : ৮)

আল্লাহ তা'আলার শিখানো দোয়া আমাদেরকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে। কারণ মানুষ শয়তানের ধোকায় পড়ে যে কোনো মুহূর্তে ঈমান হারা হয়ে যেতে পারে। ঈমানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন- মজবুত ঈমানে অল্প আমলও নাজাতের জন্য যথেষ্ট। হাশরের মাঠে ঈমানদারগণ ঈমানী নূর নিয়ে অন্ধকারকেও আলোকিত করে পথ চলবে। তখন জাহান্নামীগণ ঈমানদার লোকদেরকে একটু আলো দিতে অনুরোধ করবে। এই ব্যাপারে সূরা হাদীদের ১২-১৫নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, সে দিন (হাশরের ময়দানে) তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ। জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এইটাই বড় সফলতা। সেদিন মুনাফিক নারী-পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মুমিনদেরকে বলবে: আমাদের প্রতি একটু লক্ষ্য কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছু উপকৃত হতে পারি। কিন্ত তাদেরকে বলা হবে: পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের জন্য নূর তালাশ কর। অতঃপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকে আযাব। মুসাফিকরা ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলবে- আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? ঈমানদাররা জবাব দিবে হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে। তোমরা সুযোগের সন্ধানে ছিলে, সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করে ছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফয়সালা হাজির হলো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বড় প্রতারক (শয়তান) আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা করে চললো। অতএব তোমাদের নিকট থেকে আজ কোন বিনিময় গ্রহন করা হবে না। আর তাদের নিকটে থেকেও গ্রহণ করা হবে না; যারা সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত ছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। জাহান্নাম তোমাদের খোঁজ-খবর নিবে। এইটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।" (সূরা হাদীদ, ১২-১৫)

ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ○

"যেসব লোক ঈমান আনলো এবং নেক কাজ বা আমলে সালেহ করল তাদের জন্য বেহেশতের বাগিচা রয়েছে, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। এটাই বিরাট সাফল্য।" (আল বুরূজ ঃ ১১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

"ওহে যারা ঈমান এনেছো– তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

ঈমানদারদের অভিভাবক স্বয়ং মহান আল্লাহ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاۤؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে, তাগুত (শয়তান) তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহান্নামী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাক্বারা ২:২৫৭)

৩. ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

নামাজ ও অজু ভঙ্গের যেমন কারণ রয়েছে, তেমনি কিছু কারণে ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো মূলত তিন প্রকার। বিশ্বাসগত, কর্মগত এবং উক্তিগত। প্রত্যেক মুমিনের জন্য ঈমান ভঙের মৌলিক কারণগুলো জানা অতীব জরুরি। আলেমগণ এ ব্যাপারে অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ১০টি কারণ আলোচনা করা হলো, যেগুলো পয়েন্ট আকারে সাজিয়েছেন ইমামুদ দাওয়াহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ হাব (রহ.)।

১. **আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা:** 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার করা ক্ষমা করেন না; তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এ যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, সে এক মহাপাপ করে। (সূরা নিসা: ৪৮)
"কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদা: ৭২)

২. **নিজের ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করা:** "তারা আল্লাহকে ছাড়া যার ইবাদত করে, তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না; উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছে, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র। তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।' (সূরা ইউনুস: ১৮)

জেনে রেখো, নিরংকুশ অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে- আমরা তো এদের পূজো এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফের আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা জুমার: ৩)

৩. **মুশরিক-কাফেরদের কাফের মনে না করা:** যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত একমত, যেমন ইহুদি-খ্রিস্টান-মুশরিক ছাড়াও প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসূল বা দীনের কোনো অকাট্য ব্যাপার নিয়ে কটূক্তিকারী; যাদের কুফরির ব্যাপারে হক পন্থি আলেমগণ একমত। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (কথাকে) অমান্য করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে; আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। সে তাতে চিরকাল থাকবে এবং অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা নিসা ৪:১৪)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) কথাকে অবিশ্বাস করে তারা সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে কাফের। আর আমরা যদি তা বিশ্বাস না করি তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা.) কথাকে অবিশ্বাস করার কারণে কাফের হয়ে যাবো। নাউজুবিল্লাহ।

৪. **নবীজি (স.)-এর ফায়সালার তুলনায় অন্য কারও ফয়সালাকে উত্তম মনে করা:** "আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। তারা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতে চায় তাগুতের কাছে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" (সূরা নিসা: ৬০)

৫. **মুহাম্মদ (স.)-এর আনিত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা:** অতএব, আপনার পালন কর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে মনে না করে। এরপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তাসন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা: ৬৫)

৬. **দীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা:** আপনি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতূক করছিলাম। বলেন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুল (সা.) কে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করো না। তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফুরি করেছ।" (সূরা তওবা: ৬৫-৬৬)

৭. **জাদু করা:** "সুলায়মান কুফরি করে নি, কুফরি তো করে ছিল শয়তানরাই। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।" (সূরা বাকারা: ১০২)

৮. **মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা:** "হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইও যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরিকে বেছে নেয়, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা তাওবা: ২৩)

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে; সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা মায়িদা: ৫১)

৯. **কাউকে দীন-শরিয়তের উর্ধ্বে মনে করা:** "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা: ৩)

১০. **দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া:** "যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে, আবার তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার চেয়ে বড় জালেম আর কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণ কারী।" (সূরা সাজদাহ: ২২)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। ঈমান হারা হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আন্তরিক তওবাও কালেমা শাহাদাহর মাধ্যমে ঈমান নবায়ন করার তাওফিক দান করুন। সকল মুমিনকে হেদায়াত ও রহমতের সাদোয়ায় ঘিরে রাখুন। আমিন!

শয়তান ঈমানদারদের প্রকাশ্য শত্রু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : ২০৮)।

সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঈমানদার ছাড়া

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

"শপথ যুগের। নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর)

কুরআন শ্রবণে ঈমান বৃদ্ধি পায়

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

"প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের অন্তর কেঁপে উঠে- যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়; তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।" (সূরা আনফাল : ২)

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

ঈমান সম্পর্কে আরো কতিপয় আয়াত দেখুন–

(ক) সূরা বাকারা : ৩-৫, ৬২, ৮২, ২৮৫; (খ) আনফাল: ২, (গ) তাগাবুন : ৮, ১১, ১৪, (ঘ) ইউনুস : ১, (ঙ) বাইয়্যেনাহ : ৭-৮, (চ) আল ইমরান : ৮৪, ১০২, ১৭৯, (ছ) নূর : ৬২, (জ) নহল : ৪, (ঝ) আনকাবুত : ৫৮, (ঞ) লোকমান : ৮, (ট) আছছফ : ২, ১০, (ঠ) মোহাম্মদ : ৩৩, (ড) আহযাব : ৫৬, ৬৯, ৭০, (ঢ) তওবা : ১১-১২, (ণ) ফজর : ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, (ত) আয যুমার :৯

ঈমান সম্পর্কে কতিপয় হাদীস দেখুন–

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِقَامَ الصَّلٰوةَ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةَ وَالحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) যাকাত দেয়া। (৪) হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।" (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ১৬ ও মুসলিম ১ম খণ্ড অ: ঈমান পৃ: ৯৬)

ঈমান গ্রহণের তিনটি স্তর বা শর্ত ঃ

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ .

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন "আল্লাহর প্রতি ঈমান হচ্ছে মুখে ঘোষণা দেওয়া, অন্তরের মাঝে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কর্মের মাধ্যেমে বাস্তবে পরিণত করা।"

৪. ইসলামের অর্থ ও সংজ্ঞা

ইসলাম আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা। মানুষ যেন তার পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা দয়া করে মানুষকে সে পথ ও পন্থার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পথে চললে তিনি খুশি হবেন। কোন্ পথে চললে তিনি নারাজ হবেন, তাও বাতলে দিয়েছেন। জীবন যাপনের সঠিক নিয়ম কানুন বলে দিয়েছেন। এভাবে তিনি মানুষকে তার মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সফলতা লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। আর এই যে মুক্তির পথ, আর সফলতা লাভের উপায়, তারই নাম হলো 'ইসলাম'।

ইসলাম শব্দের অর্থ আনুগত্য করা। কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। ইসলাম শব্দে মূল ধাতু সিলমুন سِلْمٌ - এর অর্থ আবার শান্তি এবং সন্ধি। পারিভাষিক অর্থে একমাত্র আল্লাহর প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করা। এর বিপরীত সমস্ত মত ও পথ পরিহার করে চলাকেই বলা হয় ইসলাম। মানুষের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির এটাই একমাত্র সনদ। ইসলাম একটি রাজসিক দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থার নাম।

ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

"আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।" (সূরা আলে ইমরান: ১৯)

সুতরাং মানুষ যদি আল্লাহর পছন্দনীয় পথে চলতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই জানতে হবে; আল্লাহর পছন্দনীয় পথ কোনটি? তাকে অবশ্যই জানতে হবে, তার মুক্তির পথ কোনটি? তার সফলতা অর্জনের উপায় কি? অর্থাৎ তাকে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। কিন্তু, ইসলাম সম্পর্কে জানার উপায় কি?

সর্বকালে মানুষ যেন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে, আল্লাহর পছন্দনীয় পথের সন্ধান পেতে পারে, সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা আরব দেশের সর্বোত্তম মানুষটিকে তাঁর বাণীবাহক নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহ তাঁর কাছে কুরআন নাযিলের মাধ্যমে মানুষের জন্যে তার পছন্দনীয় জীবন ব্যবস্থা "ইসলাম" অবতীর্ণ করেন। তাঁর কাছে একখানা কিতাব নাযিল করেন। এ কিতাবের নাম 'আল কুরআন"। এ কিতাবের সমস্ত অর্থ ও মর্ম তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যে আল কুরআন ছাড়াও তিনি আরেক ধরনের বাণী তাঁর উপর অবতীর্ণ করেছেন; তা হলো 'শিরআতান ওয়া মিন হাজান' শরীয়াতের বিধান ও কর্মপন্থা সহজ কথায় সুন্নাতে রাসূলিহি বা হাদিসমূহ। মানুষ কীভাবে আল কুরআন অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও তিনি তার উপর অর্পণ করেছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। তিনি সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাব মানুষকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

১. তাঁর বাণী, বক্তব্য ও কথার মাধ্যমে,

২. তাঁর কাজকর্ম এবং চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে,

৩. অন্যদের কথা ও কাজকে সমর্থন করা এবং অনুমতিদানের মাধ্যমে।

নবী হিসেবে তাঁর এই তিন প্রকারের সমস্ত কাজকেই 'হাদীস' বলা হয়। এই তিন ধরনের কাজকে তিন ধরনের হাদীস বলা হয়:

১. তিনি তাঁর বাণী, বক্তব্য ও কথার মাধ্যমে মানুষকে যা কিছুবলে গেছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন, তার নাম হলো, 'বক্তব্যগত বা কওলী হাদীস।

২. তিনি তাঁর কর্ম, চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে যা কিছু বুঝিয়ে দিয়েছেন, তার নাম কর্মগত ফে'লী হাদীস'।

৩. তিনি যা কিছুর সমর্থন ও অনুমোদন দিয়ে গেছেন, তার নাম হলো, 'সমর্থনগত' বা 'অনুমোদনগত'- তাকরীরী হাদীস।

তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম, আল্লাহর পছন্দনীয় পথ কোনটি? তাঁর অপছন্দনীয় পথই বা কোনটি? আর কীভাবেই বা তাঁর পছন্দনীয় পথে চলতে হবে? এসব কথা ও নিয়ম কানুন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালার পাঠানো এসব বাণী, বক্তব্য ও নিয়ম কানুনের সমষ্টির নাম হলো 'ইসলাম।'

আমরা একথাও জানতে পারলাম, আল্লাহ্ তায়ালা যে তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের জন্যে তাঁর পছন্দনীয় জীবন যাপনের পথ 'ইসলাম' পাঠিয়েছেন, সে ইসলামকে আমরা দু'টি মাধ্যমে জানতে পারি:

প্রথমত: নবীর প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব "আল কুরআন"-এর মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত: নবীর বাণী, কাজ ও অনুমোদনসমূহের মাধ্যমে। অর্থাৎ নবীর হাদীসের মাধ্যমে।

আরেকটি কথা হলো, আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে অর্থাৎ হাদীসের মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলাম পালন করার যেসব নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, আচার-আচরণ ও রীতি-পদ্ধতি জানিয়ে ও শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার নাম হলো, 'সুন্নাতে রাসূল' বা 'রাসূলের সুন্নাহ'।

এখন এ আলোচনা থেকে আমাদের কাছে একটি কথা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তাহলো, যারা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন যাপনের পথ ইসলামকে জানতে চায় এবং ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যইঃ

১. আল্লাহর কিতাব আল কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।

২. নবীর হাদীস ও সুন্নাহকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং সেঅনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। তাহলে কুরআন-হাদীস কেন পড়বে? এ প্রশ্নটির জবাব এখন সুন্দরভাবে আমাদের জানা হয়ে গেল!

হাদীস কোথায় পাওয়া যাবে ?

এখন যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহর কিতাব 'কুরআন' তো আমাদের ঘরে ঘরে আছে। কিন্তু নবীর হাদীস কোথায় পাব? জবাব কিন্তু সোজা। আল্লাহর কিতাবের মত নবীর হাদীসও কিন্তু আমরা ঘরে ঘরে রাখতে পারি। সেই ব্যবস্থাও আমদের দেশে আছে। এখন বাংলা ভাষায় কুরআনের অর্থ, তাফসীর, হাদিসের অর্থ, ব্যাখ্যা, মাসআলা-মাসায়েলের অনেক বইপত্র পাওয়া যায়।

নবীর সাহবীগণ নবীর কাছ থেকে তাঁর হাদীস জেনে ও শিখে নিয়েছিলেন। সাহাবীদের কাছ থেকে তাঁদের পরবর্তী লোকেরা হাদীস জেনে ও শিখে নেন। অতপর তাঁদের থেকে তাঁদের পরবর্তী লোকেরা হাদীস জেনে ও শিখে নেন। এভাবে এক দেড়শ' বছর চলতে থাকে। এ সময় কিছু লোক হাদীস লিখেও রাখতেন, আবার কিছু লোক মুখস্তও করে রাখতেন।

এরপর খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয হাদীসের শিক্ষকগণকে নির্দেশ দেন, যেখানে যাঁর যে হাদীস জানা আছে, তা সব যেন সংগ্রহ করে লিখে ফেলা হয়। ইসলামের বিজয়ের সাথে সাথে সাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশে দেশে। সেই সাথে নবীর হাদীসও ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। তাই হাদীসের ছাত্র ও শিক্ষকগণ হাদীস সংগ্রহের জন্যে ছুটে বেড়ান দেশ থেকে দেশান্তরে। এভাবে তারা সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করে বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা নবীর সমস্ত হাদীস সংগ্রহ করে ফেলেন। যিনি যেখানে যে হাদীস পেয়েছেন, তিনি তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ফেলেন।

আল্লাহকে রব মানার অর্থ কী?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে যে 'রব' বলে স্বীকার করতে হবে, সেই'রবের' মানেটা কী?

'রব' মানে হচ্ছে, মালিক, প্রভু, গার্জিয়ান, প্রতিপালক, রক্ষক, সকল ক্ষমতার অধিকারী, কর্তা, শাসক। আমি আল্লাহ্কে রব মানি, এই কথার অর্থ হলো, আমি কেবল আল্লাহকেই একমাত্র মালিক অভিভাবক, প্রতিপালক, রক্ষক, ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকর্তা মানি। আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও মালিক মনে করি না। আর কাউকেও প্রভু মানি না। প্রয়োজন পূরণকারী মনে করি না। রক্ষাকর্তা মনে করি না। আর কারো হুকুম মানি না। আইন মানি না। আর কারো কাছে মাথা নত করি না। এগুলোই হলো আল্লাহ্কে রব মানার অর্থ। আল্লাহকে এভাবে মেনে নিলেই তাঁকে রব মানা হয়। আর তাঁকে এভাবে মানাই ঈমানের দাবী।

৫. দ্বীন কাকে বলে?

এবার দেখা যাক ইসলামকে 'দ্বীন' মানার অর্থ কী?

'দ্বীন' (اَلدِّيْنُ) মানে, জীবন যাপনের পথ। মানুষ তার গোটা জীবন কীভাবে চালাবে? কীভাবে ঘর সংসার চালাবে? কোন্ নীতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে, চাষ বাস করবে? কীভাবে দেশ চালাবে, সমাজ চালাবে? কীভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে? এসব নিয়ম কানুন ইসলামে রয়েছে। এসব নিয়ম কানুনকেই দ্বীন বলা হয়। ইসলামকে দ্বীন মেনে নেয়ার মানে হলো, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবনের সকল কাজ-কারবার চালাবার জন্যে যে নিয়ম কানুন এবং বিধি বিধান দিয়েছে, সেগুলোকে মেনে নিয়ে, সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

মানুষের জীবনের ছোট বড় সকল কাজের ব্যাপারেই ইসলাম নিয়ম কানুন দিয়েছে। একেবারে পায়খানা পেশাব কীভাবে করতে হবে? তা থেকে নিয়ে রাষ্ট্র কীভাবে চালাতে হবে? সব ব্যাপারেই ইসলাম নিয়ম কানুন বলে দিয়েছে। আর এই গোটা নিয়ম কানুন ও বিধি ব্যবস্থার নামই হলো'দ্বীন ইসলাম' বা ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনের পথ।

৬. রাসূল মানার অর্থ কী?

এবার দেখা যাক, হাদীসে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মানার কথা বলা হলো, তার আসল মর্ম কী?

আসলে মুখে মুখে কেবল 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বললেই তাঁকে রাসূল মানা হয়না। তাকে রাসূল মানার অর্থ হলো, এই কথাগুলো মেনে নেয়া যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে মানুষের কাছে জীবন যাপন করার সকল নিয়ম কানুন পাঠিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে, তা তিনি নিজের জীবনে আমল করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি যা কিছু সত্য বলেছেন, তাই সত্য! আর যা কিছু মিথ্যা বলেছেন, তা সবই মিথ্যা। তিনি যা করতে বলেছেন, তাই করতে হবে, সেটাই ইসলাম। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা করা যাবে না। কারণ সেটা কুফরি। তিনি ইসলামের যে কাজ যেভাবে করেছেন, আমাদেরকেও সে কাজ ঠিক সেভাবে করতে হবে। এটাকেই বলে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করা। তিনিই সত্য মিথ্যার মাপকাঠি। সেই মাপকাঠিতে মেপে মেপেই সকল মুসলমানকে আমল করতে হবে। এই হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মানার অর্থ।

৭. আখেরী ও শেষ নবী خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

পথভ্রষ্ট মানুষকে হেদায়াতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তারপরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য মনোনীত নবী। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা তাঁর উম্মতের মধ্যেই গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার এ মহান জিম্মাদারী তাঁর উম্মতের মাঝে যারা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানে-জ্ঞানী তাদের উপর দিয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন, তার পরে যদি কেউ

নবী হতো সে হতো ওমর (রা)। কিন্তু পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবে না। আদম (আ) প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী ছিলেন। তাঁকে দিয়ে নবীদের দরজা খোলা হয়েছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে এ ধারা বন্ধ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী, কুরআনের দলীল

মুহাম্মদ যে শেষ-নবী এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ۧ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (৩৩-সূরা আল আহযাব : ৪০)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের সুসংবাদ পূর্ববর্তী কিতাবেও আছে

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ.

"হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে, আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমদ।" (সূরা আস-সফ : ৬)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) মহাবিশ্ব মানবতার নবী

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

"হে নবী! আপনি বলে দিন। হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৮)

وَ مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"(হে নবী) আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

"আমি আপনাকে সমগ্র জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না!" (সূরা সাবা : ২৮)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইনতিকাল করেছেন

"মানুষ মাত্রই মরণশীল। রাসুলুল্লাহ (সা.) যেহেতু মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুবরণ করাই স্বাভাবিক। আল্লাহ বলেন, তুমিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সুরা : জুমার, আয়াত : ৩০)

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

"মুহাম্মদ তো রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা কী (তার আদর্শ হতে) ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের সীল মোহর

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنِهٖ ـ

ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন : "আমি আল্লাহর নিকট খাতামুন্নাবিয়ীন হিসেবে তখনও লিখিত ও নির্দিষ্ট, যখন আদম (আ.) মাটির গাড়া হিসেবে পড়েছিলেন।" (মুসনাদে আহমদ, শরহে সুন্নাহ, বায়হাকী ও হাকেম)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করল। কিন্তু এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে ছিলো। অতপর লোকেরা এসে অট্টালিকা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকল ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি! রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি সেই ইট, আমিই সর্বশেষ নবী। (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড অ: আম্বিয়া কিরাম (আ:) পৃ: ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড অ: ফযীলত পৃ: ৩০৬)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ اللّٰهُمَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ خَاتَمُ وَكَبَتَ فِىْ الذِّكْرِ اَنَّ مُحَمَّدًا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে স্বীয় প্রতিটি সৃষ্টির তকদীর ঠিক করে দিয়েছেন এবং লাওহে মাহফুযে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) খাতামুন্নাবিয়ীন।" (সহীহ মুসলিম)

সকল নবী বৈমাত্রেয় ভাই

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى اَلاَنْبِيَاءُ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عِيْسٰى نَبِىٌّ ـ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ বলেছেন (সা.)- "আমি ঈসার সব চেয়ে নিকটবর্তী নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সমতুল্য। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোন নবী নেই।" (মুসলিম)

৮. রিসালাত

রিসালাত (رِسَالَةٌ) অর্থ পৌঁছানো। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর হুকুম-আহকাম ও হেদায়াত পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাকে রিসালাত বলে। যাঁদেরকে আল্লাহ মানুষের মধ্য হতে নির্বাচন করে মানুষের কাছে তার হুকুম-আহকাম হেদায়াত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে মনোনীত করেন, তাদেরকে নবী-রাসূল বলে। পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল আগমন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পঁচিশজন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে। রিসালাত আল্লাহর বিরাট অবদান। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। বলে বা চেয়ে কিংবা দাবি করে এ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না। প্রত্যেক নবীর দাওয়াত ছিল একই। তাঁদের কোন একজনকে অস্বীকার করলে সকলকে অস্বীকার করা বোঝায়।

নবীর প্রতি ঈমান আনার অর্থ এই যে, তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য করা। হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে ঈসা (আ) পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাদের কেউ ছিলেন এলাকাভিত্তিক কিংবা জাতিভিত্তিক। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন পুরো বিশ্ববাসীর জন্য নবী ও রাসূল। নবী মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এসে নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে ততোদিন তাঁর নবুয়ত থাকবে। আল্লাহর কাছে তারাই নাজাত পাবে যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্যের অনুসারী হয়ে জীবন যাপন করবে।

নবী-রাসূলগণের আগমনের পূর্বে মানুষ ছিল বর্বর জাতি। তারা মারামারি, কাটাকাটি, যুলুম, নির্যাতন, লুটতরবাজ, হত্যা, মেয়ে সন্তান হলে জীবিত কবর দেয়া তাদের দৈনিন্দিনের কাজ ছিল। দেড় হাজার বছর পূর্বে তারা বিভিন্ন কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে মদ, জুয়াসহ মূর্তি পূজায় লিপ্ত থাকত। এ সব পথ হারা মুর্খ মানুষদের নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী রাসূলগণ তাদেরকে অসৎ কাজের নিষেধ করতেন।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির আগে আরবের লোকেরা তার সততা আমানতদারিতা ও সত্যবাদিতার জন্য তাকে আল-আমীন হিসেবে ভূষিত করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর দাওয়াত দিতেন- হে লোকসকল এক আল্লাহর ইবাদত কর। আল্লাহর সাথে কোন শরীক কর না। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের জীবন মরণের মালিক। তাঁর হুকুম ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। তোমরা মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, চুরি, যুলুম, নির্যাতন, ডাকাতি, লুট-তরাজ, অন্যায়ভাবে রক্তপাত করনা। এটা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। তোমরা মানুষের প্রতি ইনসাফ কায়েম কর। উচু নীচু বংশ মর্যাদা ভেদাভেদ সৃষ্টি কর না। এতিমের হক নষ্ট কর না। আল্লাহর আনুগত্য করে চল। শয়তানের পথ হতে দূরে থাক। শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চললে তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি দিবেন। মৃত্যুর পরে চিরশান্তির জান্নাতে স্থান দিবেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল (সা.) রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ নবী (সা.) নাই, তাঁর দায়িত্ব উম্মতে মোহাম্মদীর উপর। আমরা অর্পিত সে দায়িত্ব পালন না করলে গুনাগার হবো।

রিসালাত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

অহী রাসূলের তৈরিকৃত নয়-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ۔ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ○

"তিনি যদি নিজের কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন তাহলে আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর নিশ্চয়ই তাঁর শাহরগ কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই আমাকে তা থেকে ফেরাতে পারবে না।" (সূরা আল হাক্কাহ-৪৪-৪৭)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○ (سورۃیس)

"আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তার জন্যে তা শোভনীয়ও নয়। এটাতো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন।" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)।

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

"তিনি তার প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। যা বলেন তা শুধু অহী।" (৫৩-সূরা নজম ঃ ৩-৪)

সকল নবী-রাসূলগণের একই দায়িত্ব ছিলঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি এই বলে তাদের আহ্বান জানয়েছিলেন, আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তাগুতের আনুগত্য পরিহার কর। এরপর তাদের মধ্য হতে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দান করলেন। আর কারো ওপর গোমরাহী চেপে বসলো। সুতরাং তোমরা জমীনে পরিভ্রমণ করো আর দেখ মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কি হয়েছিল।" (সূরা নাহল : ৩৬)

রাসূল মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

"তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছে। যে তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন। তোমাদের ক্ষতি হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক। তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই তিনি কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।" (সূরা তাওবা: ১২৮)

৯. রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য

সকল মতাদর্শের উপর ইসলামকে বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই আল্লাহ! তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ (আল-কুরআন) ও সত্য দ্বীন (আল-ইসলাম) সহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে অন্য সব মতবাদের উপর বিজয়ী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা ফাতাহ্ : ২৮)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

"আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন সব কথা তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাকারা: ১৫১)।

রিসালাত সম্পর্কে কুরআনের আরো কিছু আয়াতের টিকা দেখুন : সূরা বাকারা-২৫৩, ইমরান-১৪৪, কাহাফ-১১১, ইউনুছ-৪৯, আনয়াম-১৯, নিসা-৭৯, আরাফ-১৫৮, সাবা-২৮, ইয়াসিন-২, ৩, মায়িদা-৬৭, সূরা আম্বিয়-৭, ৮, সূরা নজম- ৩, ৪।

প্রকৃত ঈমানদারদের পরিচয়

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ .

"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আকাঙ্ক্ষিত মানের মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত বিধানের অধীন করে।" (শহরে সুন্নাহ)।

শেষ নবী ও পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে উপমা

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ : এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু সে এক কোণে একটি ইটের

জায়গা খালি রেখে দিলো। অতপর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে থাকলো-ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমিই সেই ইট, আমি সর্বশেষ নবী।" (বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায় আম্বিয়া কিরাম (আ), পৃঃ ১৮৭ ও মুসলিম ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায় ফযীলত, পৃঃ ৩০৬)

১০. মুমিনের পরিচয় ও গুণাবলী

সত্যিকার ঈমানদার কীভাবে হওয়া যায়? হাদীসে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

ذَاقَ طُعْمَ الْاِيْمَانُ مَنْ رَّضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا .

"ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে (অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানদার হয়েছে), যে ব্যক্তি সন্তুষ্টির সাথে আল্লাহকে 'রব' মেনে নিয়েছে। ইসলামকে 'দ্বীন' মেনে নিয়েছে। আর মুহাম্মদকে 'রাসূল' মেনে নিয়েছে।" (মুসলিম: আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব)

হাদীসটিতে বলা হয়েছে, প্রকৃত মুমিন হতে হলে মনের সন্তুষ্টির সাথে তিনটি কথা স্বীকার করতে হবে। সেগুলো হলো:

১. আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করতে হবে।

২. ইসলামকে দ্বীন বা জীবন চলার পথ হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং

৩. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মেনে নিতে হবে। সার্বিক বিষয়ে তাঁকে পথ নির্দেশক হিসেবে মেনে নিতে হবে।

মুমিনের গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য আরো অধ্যয়ন করুন:

- সূরা বাকারা, ২: ১-৫ বর্ণিত ৬টি গুণ,
- সূরা তওবা৯: ১১২ আয়াতে উল্লিখিত : ৮টি গুণ,
- সূরা আররাদ: ১৩: ২০-২৪ আয়াতে ৮ টি গুণ,
- সূরা মুমিনুন: ২৩: ১-১১ আয়াতে উল্লিখিত: ৭টি গুণ,
- সূরা আহযাব: ৩৩: ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত: ১০টি গুণ,
- সূরা মাআরিজ: ৭০: ২২-৩৫ আয়াতে বর্ণিত ১০টি গুণ,
- সূরা ফোরকান: ২৫: ৫৮-৭২ নং আয়াতে বর্ণিত ১৩ গুণ।

উক্ত আয়াতগুলি ছাড়াও কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত মুমিনের গুণাবলিগুলি গুলি খুজে বের করে তার তালিকা করে পর্যায়ক্রমিকভাবে এই গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করা সকল মুসলমানের বর্তব্য। এখানে উল্লেখ্য যে, মুমিনের বেশ কিছু কমন গুণাবলী কুরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. নেশা/সিগারেট ও মাদক দ্রব্যের অপকারিতা

মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা-

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক বিষবৃক্ষের আরেকটি বিষফল হচ্ছে মাদকাসক্তি। এ মাদকাসক্তি বর্তমানে সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশেষভাবে মুসলিম বিশ্বকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলছে। বর্তমানে প্রচলিত মাদকদ্রব্য হল মদ, গাজা, হেরোইন, ফেনসিডিল, প্যাথেডিন ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে এর ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। মাদকদ্রব্য ব্যবহারে মানুষ যে শুধু নেশাগ্রস্থ হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তা নয়; বরং তা মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুতে রূপান্তরিত করে দেয়। তাই দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ছিনতাই, রাহাজানী, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের মত জঘণ্য অপরাধসমূহ এ সব পশুবৎ মাদকাসক্তদের হাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারী এসবই শয়তানের অপবিত্র কাজ। তোমরা তা হতে বিরত থাক। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।" (সূরা মায়িদা-৯০)

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ .

"শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা, ও হিংসা বিদ্বেষসৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও নামাজ হতে তোমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তাই তোমরা এসব জিনিস হতে কি বিরত থাকবে?" (সূরা মায়িদা-৯১)

মাদক দ্রব্যের সম্পর্কে হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় মদপান করলো, অতঃপর তা থেকে তওবা করলো না, সে আখিরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (বুখারী)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَيْئٌ

ইবনে উমর (রা.) বলেছেন "শরাব এমন সময় হারাম হয়েছে, যখন মদীনায় একটু মদ ও ছিল না।" (বুখারী)

عَنْعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَاتَعُوْدُوْا شُرَابَ الْخَمْرِ اِذَا مَرِيْضُوْا (الادب المفرد)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আমর ইব্ন আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- "মদ্যপায়ী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে ও সেবা করতে যেয়ো না।" (আদাবুল মুফরাদ)

১২. আত্মহত্যা قَتلُ الْاَنْفُسِ

আত্মহত্যা কী ?

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা একটি কবীরা গুনাহ। চরম নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত কাজ। আত্মহত্যা হলো নিজে নিজেকে হত্যা করা। আল্লাহর দেয়া প্রাণ ও আয়ুস্কাল একটি মস্ত বড় নিয়ামত এবং আখেরাতের জন্যে নেক কাজ করার অপূর্ব সুযোগ ও সীমিত অবকাশ। একে যারা স্বহস্তে খতম করে, তাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আত্মহত্যা মহাপাপ ও কবিরা গুনাহ। আত্মহত্যাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আত্মহত্যা না করার নির্দেশ :

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِهٖ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

"এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করল। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।" (সহীহ বুখারী)

আত্মহত্যা করার পরিণাম :

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ .

সাবেত ইবনে দাহহাক নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাকে সে অস্ত্র দিয়েই দোযখের মধ্যে শাস্তি দেয়া হবে।" (মুসলিম ১ খণ্ড, অ: পৃ: নং- ১৬৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلَّذِىْ يَخْنُقُ نَفْسَهٗ يَخْنُقُهَا فِىْ النَّارِ وَالَّذِىْ يَطْعَنُهَا يُطْعَنُهَا فِىْ النَّارِ .

আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ফাঁসি লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্ষা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে। জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দিবে।" (সহীহ বুখারী)

আত্মহত্যাকারীর জানাযায় সমাজের বিশিষ্ট আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শরীক না হয়ে সাধারণ মুসলমানরা আত্মহত্যাকারীর জানাযা আদায় করে তাকে দাফন করবেন। আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ হওয়ায় এই কাজকে নিরুৎসাহিত করার জন্যই তাদের যানাজা এই ভাবে পড়া উচিত।

১৩. সুন্নাত ও বিদ'আত

সুন্নাত শব্দের অর্থ- পথ, পন্থা ও পদ্ধতি (অনুমোদন) আল্লাহর সুন্নাত মানে তার কর্ম কৌশল তাঁর (আনুগত্য) নিয়ম ও পদ্ধতি।

আর নবীর সুন্নাত হচ্ছে নিয়ম-নীতি পন্থা পদ্ধতি যা রাসুলুল্লাহ (সা.) বাস্তব কাজে কর্মে দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ রাসূল করীম (সা.) এর কথা ও কাজ বা অনুমোদন যা রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব কর্মনীতিই হলো সুন্নাত।

কুরআন ছাড়া রাসূলের যে কথা বা কাজ অনুমোদন-সম্মতি সহীহ বর্ণনা সূত্রে পাওয়া যায় বা গেছে তাই সুন্নাত।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে আদর্শ দুনিয়ার মানুষের সামনে বাস্তব উপস্থাপনের মাধ্যমে আমল করে দেখিয়ে গিয়েছেন তাই সুন্নাত।

বিদ'আত-সুন্নাতের বিপরীত

যা রাসূল (সা.) করেন নাই, বা করেছেন বলে কোন দলীল প্রমাণ ও সত্যতা পাওয়া যায় না, বা রাসূলের যুগে কোনো সাহাবী করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাইনি তাই বিদয়াত।

দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদয়াত হচ্ছে এমন কোনো কথা, কাজ বা আমল- ইবাদাত ইসলামী শরীয়তে নতুনভাবে প্রবর্তন করা, যা রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের সময় শরীয়তে প্রবর্তন করা ছিল না। তা নতুনভাবে শরীয়তে মনগড়াবা স্ব-পরিকল্পিতভাবেও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ইসলামী শরীয়তে সংযুক্ত করা হয়েছে। রাসূলের যুগে ছিল না, এমন নীতি বা পথ সম্পূর্ণ নতুনভাবে শরীয়তে নিয়ে আসা, যার পক্ষে ও সমর্থনে কোনো দলিল কুরআন ও হাদীসে নাই তাই বিদয়াত।

বর্তমান মুসলিম সমাজে কার্যত সুন্নাত ও বিদয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। বিদয়াত অনেক স্থানে সুন্নাত নামে প্রতিষ্ঠিত - যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বাস্তব ভূমিকা বুঝবার কোনো উপায় নাই কোনটি সুন্নাত-কোনটি বিদয়াত। বেশি সংখ্যক মানুষ বিদয়াতকে সঠিক ইবাদত মনে করে আমল করে। নবী করীম (সা.) বলেছেন সকল বিদয়াত গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা)। এ বিদয়াত মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

তাই বিদয়াতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল, যা করা সম্পর্কে আমাদের কোনো হুকুম বা নির্দেশনা নেই তা অগ্রাহ্য। (মুসলিম)

প্রত্যেক বিদয়াত গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা -كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

প্রত্যেক বিদয়াতী দোযখী-وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

বস্তুত দ্বীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা বা কোন নতুন জিনিসকে দ্বীন মনে করে তদনুযায়ী আমল করা, আমল করলে সওয়াব হবে মনে করাই বিদয়াত।

আল্লাহ বলেন–

الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজকের দিনে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা: ৩)

রাসূল (সা.) এরশাদ করেন: اِتَّبِعُوْا وَلَا تَبْتَدِعُوْ

তোমরা শূধু রাসূলের দেওয়া আদর্শকে অনুসরণ করে চলো এবং কোনোভাবে বিদয়াত কর না। তিনি আরো বলেন, "সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর সর্বোচ্চ কর্ম বিধান হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.) এর উপস্থাপিত জীবন পন্থা।"

বিদয়াত হচ্ছে ইসলামে একটি বড় গর্হিত (ঘৃণীত) কাজ। সর্ব পর্যায়ে তা বর্জন করে চলা মুমিনের কর্তব্য।

৪টি কারণে সমাজে বিদয়াত চালু হয়–

১. নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে সমাজে চালিয়ে দেয়া-

২. কোনো আলেম শরীয়ত বিরোধী কাজ জানা সত্ত্বেও করেছন, তা দেখে জাহেলী লোকেরা শরীয়ত সম্মত মনে করে আমল করা আরম্ভ করে দেয়। ফলে সমাজে তা বিদয়াত হিসেবে (চালু) প্রচলন হয়ে পড়ে।

৩. জাহেলী লোকেরা শরীয়ত বিরোধী কাজ শুরু করে, সে সমাজের আলেম সামাজ বিদয়াত জানা সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করে নিরব ভূমিকা পালন করে। ফলে মানুষ মনে করে তা নাজায়েজ হবে না বলে আমল আরম্ভ করে আসলে তা বিদয়াত।

৪. কোন কাজ ভালো সুন্নাত সম্মত- কিন্তু কোনো আলেম কখনও তাকে সুন্নাত বলেন নি। হঠাৎ করে বহুকাল পরে কোন আলেম সেটা কুরআন-হাসিদের জায়ীফ বা জাল দলিল দিয়ে সুন্নাত বলে ফতোয়া দিলে লোকেরা প্রকৃত সুন্নাতকে বিদয়াত মনে করে, আসলে তা বিদয়াত নয়।

১৪. জ্ঞান অর্জন ও তারবিয়াহ

ইলম عِلْمٌআরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ-জ্ঞান, বিদ্যা। ব্যবহারিক অর্থে বিদ্যা অর্জনকেই 'ইলম' বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায় কুরআন ও হাদীসভিত্তিক এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা; যার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর চলা সহজ হয়। ইলম বা বিদ্যা আলোকস্বরূপ। আলো যেমন- অন্ধকার দূরীভূত করে তেমনি জাহিলিয়াত বা অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করে জ্ঞান সত্য-সুন্দর কল্যাণের পথকে আলোকিত করে।

অন্যদিকে ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সবার ওপর ফরয। যতটুকু শিক্ষা অর্জন করলে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, শিরক্ ওবিদয়াত এবং স্রষ্টাকে জানা যায়; ঠিক ততটুকু জ্ঞানার্জন করা ফরয। দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা শরয়ী ফরয। আর দুনিয়ার ইলম শিক্ষা করা দুনিয়ার ফরয।

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

عِلْمٌঅর্থ সমস্ত মূল বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন, অনুভূতি লাভ। ইলম শব্দটি 'আলামত' হতে নির্গত হয়েছে, আর আলামত মানে الاشَارَةُ ও اَلدِّلَالَةُ কোনো বিষয়ে প্রত্যক্ষ বুঝানো, কোন জিনিসের দিকে ইঙ্গিত। জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۝٣
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

(১) পড়, (হে নবী!) তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (৩) পড়, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক-১-৫)

اَلرَّحْمٰنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٢ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٣ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٤

"(১-২) পরম করুণাময় আল্লাহ এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (৪) এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আর-রহমান-১-৪)

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

"(১) হে কম্বল আবৃতকারী, (২)উঠ, সাবধান কর (৩)তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।" (মুদ্দাসসির-১, ৩)

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।" (সূরা মুযাদালা-১১)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ ۝

"বল, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কী সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক ও অভিন্ন হতে পারে?" (সূরা রায়াদ-১৬)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٩

"আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে।" (সূরা যুমার-৯)

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির-২৮)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"আল্লাহ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউই ইলাহ হতে পারে না।" (সূরা ইমরান-১৮)

وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

"পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পাকা-পোখত লোক তাঁরা বলে আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি, সবই আমাদের রবের তরফ হতে এসেছে। আর সত্য কথা এই যে, কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই লাভ করে।" (সূরা আলে-ইমরান-৭)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

"আর সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য হতে একজন বান্দাহকে পেল, যাকে আমি আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম। এবং আমার তরফ হতে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম।" (সূরা কাহাফ-৬৫)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٩

"এটা কি করে সম্ভব যে, যে ব্যক্তি তোমার আল্লাহর এই কিতাবকে, যা তিনি তোমার প্রতি নাযিল করেছেন, সত্য বলে জানে, আর যে ব্যক্তি এই মহা সত্যের ব্যাপারে অন্ধ, তারা দুইজনেই সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোক মাত্রই কবুল করে থাকে।" (সূরা রায়াদ-১৯)।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

"মূসা তাকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার সাথে থাকতে পারি যে, আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেবেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে।" (সূরা কাহাফ-৬৬)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝١٢٢

"ঈমানদার লোকদের সকলেই অভিযানে বের হয়ে পড়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এরূপ কেন হল না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের সমঝ লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত যেন তারা বিরত থাকতে পারে।" (তওবা-১২২)

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

"আর বল, হে আমার প্রভু! তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (সূরা ত্বহা-১১৪)

জ্ঞান অর্জন ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

"হে আমাদের রব! তাদের প্রতি তাদের জাতির মধ্য হতেই এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও বিজ্ঞ।" (সূরা বাকারা-১২৯)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

"যেমন আমি তোমাদের প্রতি তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায় তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে,তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।" (সূরা বাকারা-১৫১)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

"তিনি সেই সত্ত্বা! যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।" (সূরা জুমুয়া-২)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

"এবং আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান-৪৮)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

"প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, তাঁদেরই মধ্য হতে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করে এবং তাদেরকে কিতাবও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন অথচ ইতিপূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।" (আলে-ইমরান-১৬৪)

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

"(নবী) তিনি তো ইহাই বলবেন যে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এজন্য যে, তোমরা কিতাব নিজেরা শিখ ও অন্যদেরকে শিক্ষা দাও।" (সূরা আলে-ইমরান-৭৯)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۝

"আমি লোকমান কে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এ উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শোকর আদায়কারী হও।" (সূরা লোকমান-১২)

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝

"এমন একজন রাসূল, যেতোমাদেরকে আল্লাহর স্পষ্ট হেদায়াত দানকারীআয়াতসমূহ শুনান, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসে।" (সূরা তালাক-১১)

জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানীর মর্যাদা

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابن ماجه)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স.) বলেছেন, "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপরই ইলম শিক্ষা করা ফরয।" (ইবনে মাযাহ)

ইনতিকালের পরও তিনটি নেক আমল বিদ্যমান থাকে

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ ـ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন মানুষ মারা যায়– তখন তার সকল আমল বা কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল বা কাজ বন্ধ হয় না (ক) সদকায়ে জারিয়া, (খ) এমন ইলম (বিদ্যা) যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, (গ) এমন সুসন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে। (আর তার দোয়া তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছতে থাকে)।" (মুসলিম ৫ম খণ্ড)

১৫. পবিত্রতা (اَلطَّهَارَةُ)

পবিত্রতা কী?

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ইবাদতের জন্যে জরুরি। সালাত পড়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা। পাক-সাফ বা পবিত্র থাকলে দেহ-মন দু'টিই ভালো থাকে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে পাক-পবিত্র থাকলে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত থাকা যায়। সুতরাং সর্বদিক হতেই ইসলামের এই বিধান সার্বজনীন।

আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে ভালোবাসেন

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীকে ভালোবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বনকারীকেও ভালোবাসেন।" (সূরা বাক্বারা ঃ ২২২)।

কুরআন স্পর্শের পূর্ব শর্ত পবিত্রতা

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○ فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ ○ لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝

"নিশ্চয় এটি এক অতীব মর্যাদাপূর্ণ কুরআন। এটি এক সুরক্ষিত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ আছে। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া এটা কেউ স্পর্শ করতে পারে না।" (সূরা ওয়াক্বিয়া ও ৭৭-৭৯)।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ

يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○ قُمْ فَاَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

"হে চাদর আচ্ছাদনকারী! উঠুন ও সতর্ক করুন। আপনার পালনকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।" (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ১-৫)।

পবিত্রতা সম্পর্কে হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ

আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : "প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকতে না পারার কারণেই বেশির ভাগ লোকের কবর আযাব হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমদ)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (ترمذي)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) নবী করী (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামাজই কবুল হয় না।" (তিরমিযী)

অযু সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

ঈমানদার বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য উপযুক্ত করে নেয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা যথা নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করাই হল অযু।

নামাজী লোকের মুখ মণ্ডল ও হাত-পা অযুর কারণে কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে যাবে। আর এই চিহ্ন দেখে হুজুর (সা.) কিয়ামতের দিন অসংখ্য লোকের মধ্যে তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন ও তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। অযু ব্যতীত নামাজ হয় না। অযু সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাজে দাড়াতে উদ্যত হও তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, ধৌত কর এবং দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর তোমরা তোমাদের মাথা মাছেহ কর এবং পা গেড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

অযু ছাড়া সালাত হবে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ ۝

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলে, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তির ওযু ভঙ্গ হয়েছে, ওযু না করা পর্যন্ত তাহার সালাত কবুল হবে না।" (মুসলিম ২য় খন্ড অ: তাহারত, পৃ: নং- ৩২)

অযুর কারণে গুণাহসমূহ ঝরে পড়ে

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهٖ ۝

উসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে তার সমস্ত শরীর হতে গুনাহ ঝরে পড়ে এমনকি তার নখের নিচ হতেও।" (বুখারী ও মুসলিম)

১৬. সালাত (নামাজ)

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। কেন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সুরা যারিয়াত : আয়াত ৫৬)।

কীভাবে আমরা আল্লাহর ইবাদত করব রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে তার শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিখানো পদ্ধতিতে ইবাদত করলে, সেই ইবাদত মৃত্যুর পরে আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কিয়ামতের দিনে যিনি দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত পন্থায় ইবাদত করবেন, তিনি কামিয়াবি বা সফলকাম হবেন। ঈমান আনার পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হলোসালাত বা নামাজ।

সালাতের পরিচয় :

'সালাত' আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় প্রচলিত নামাজ মূলত ফারসি শব্দ। সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, পবিত্রতা বর্ণনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা নত হওয়া, অবনত করা ও বিস্তৃত করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের নিয়ম মোতাবেক এক বিশেষ পদ্ধতিতে রুকু-সিজদাসহ আল্লাহর ইবাদত করাকে সালাত বলা হয়। ইসলামের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। মিরাজের রাত্রে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত। ঈমান আনার সাথে সাথেই প্রত্যেক বালেগ ও আকেল (সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন) লোকের উপর সালাত ফরয। একজন ঈমানদার ও একজন কাফেরের মাঝে পার্থক্য হলো ঈমানদার সালাত পড়ে আর কাফের সালাত পড়ে না। সালাতই মুসলমানের পরিচয়। এই সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ কারণে সালাতকে মুমিনদের মি'রাজ বলা হয়েছে।

মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যেমন আল্লাহর সাথে কথোপকথন হয়েছে নামাজেও নামাজির সাথে আল্লাহর বাক্যালাপ হয়।আরবিতে নামাযের মধ্যে তাকবির, সানা, তাউজ, তাসমিয়া, সুরা, কিরাত, তাসবিহ, তাশাহুদ, দুরুদ, দোয়ে মাসুরা, দোয়া কুনূত ইত্যদি যা কিছু নামাযে পাঠ বা তেলাওয়াত করা হয়। তার সব কিছু আরবি এবং বাংলা অর্থ সহ লেখা হয়েছে। যাতে একজন পাঠক অর্থের দিকে খেয়াল করে ইখলাস, খুশু-খুজু ও সুন্নাহ অনুযায়ী নামাজ আদায় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আর জান্নাতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোনো বান্দা যখন বলে, "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন", তখন আল্লাহ বলেন, "হামিদানী আবদি" অর্থাৎ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, "আর রাহমানির রাহিম", তখন আল্লাহ বলেন, "ইসনা অলাইয়া আবদি", অর্থাৎ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, "মালিকি ইয়াউমিদ্দীন"। আল্লাহ বলেন, "মাজ্জাদানে আবদী", আর্থাৎ আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছে। বান্দা যখন বলে, "ইয়্যাকানাবুদু ওয়াইয়্যাকানাস্তাইন", আল্লাহ বলেন, "হাযা বাইনি ওয়া বাইনা আবদী, ওয়ালে আবদী মা'সাআলা", অর্থাৎ এ হচ্ছে আমারও আমার বান্দার মাঝের কথা। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা যখন বলে, "ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাত্বাল্লাজিনা আন্ আমতা

আলাইহিম গাইরুল মাগদুবে আলাইহিম অলাদদোয়াল্লীন", তখন আল্লাহ বলেন "হাযা লি আবদী ওয়ালি আবদী মা.সাআলতা" অর্থাৎ এই সব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। (সহিহ মুসলিম শরিফ: ৩৯৫)

নামাজে বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে একনিষ্ঠ এবং একাগ্রচিত্তে কথা বলেন। নিজের সমস্ত গর্ব-অহংকার ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজ প্রভুর সামনে দ্বীন ও হীনভাবে ভীতি ও আশা নিয়ে বাক্যালাপ করে। আর আল্লাহ বান্দার এই আত্মসমর্পিত অবস্থা অবলোকন করেন এবং বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার কাঙ্ক্ষিত সকল কামনা-বাসনাকে কবুল করে নেন। আর এভাবেই বান্দার সালাত তার মনিবের সাথে মি'রাজে পরিণত হয়।

নামাযের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

"নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত : আয়াত৪৫)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاَةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, "জান্নাতের চাবি হল ছালাত। আর ছালাতের চাবি হল পবিত্রতা।" মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭০৩; তিরমিযী হা/৪; মিশকাত হা/২৯৪, পৃঃ৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭৪, ২/৪৩।

আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য নামাজই উৎকৃষ্ট তরিকা। রাসূল (সা.) কখনো কোনো সমস্যায় উপনীত হলে তৎক্ষনাৎ নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন তার জিহবা দ্বারা বান্দা যা বলে তার অঙ্গগুলো ঐ ভাবে কাজ করার কারণে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ডেকে দোয়া করলে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। বান্দার কখন কিসের প্রয়োজন আল্লাহ শুনেন ও জানেন। একজন মুমিন যখন নামাজে দাঁড়াবে তখন মনে করতে হবে- এ নামাজ আমার জীবনের শেষ নামাজ। এ নামাজে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আমি আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছে; এ বিশ্বাস রেখে নামাজ পড়তে হবে। আমি যা করছি, আমার দুই কাঁধে দুই জন ফেরেস্তা তা লিখে রাখছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু মনে করে নামাজে মন অন্য দিকে ধাবিত হলে মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করার জন্য ফিরিয়ে আনতে হবে। নামাজের পঠিত সূরাগুলোর অর্থ অনুধাবন করতে হবে। পঠিত আয়াতে জান্নাতের বিষয় আসলে জান্নাতের জন্য দোয়া করতে হবে। জাহান্নামের আয়াত আসলে তা থেকে নাজাত চাইতে হবে। আদেশ-নিষেধের আয়াত আসলে তা পালনের তৌফিক কামনা করতে হবে।

রাসূল (সা.) কীভাবে নামাজ পড়েছেন; উনার নামাজ পড়ার পদ্ধতিতে আমার রুকু, সিজদা হচ্ছে কিনা আমার নামাজ ধীরস্থির হচ্ছে কিনা; সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নামাজ পড়ে তৃপ্তি পেলে বুঝতে হবে, আমার নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে, সে নামাজ আল্লাহর নিকট পৌঁছবে। নামাজ পড়তে হবে বুঝে। যেমন: সূরা-ফাতেহা, সূরা-আল আসর, তাশাহুদ, দুরুদে ইব্রাহিম, দোয়ায়ে কুনুত প্রত্যেকটি

আয়াতের অর্থ বুঝে নরম দিলে নিজকে গুনাহগার মনে করে জাহান্নামকে সামনে রেখে কঠিন হাশরে আল্লাহর দিদারের প্রত্যাশায় নামাজ পড়লে সে নামাজ আমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন-কোন মুসুল্লি মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি কোন প্রানীর ছবি সম্বলিত পোষাক, যেমন, ট্রাউজর, গেঞ্জি, শার্ট, মৌজা, জেকেট ইত্যদি পরিধান করে নামাজ আদায় করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ স: বলেছেন যেখানে কোন প্রাণির ছবি থাকে সেখানে রহমতের কোন ফেরেশতা থাকে না। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করার সময় দেখেন যে তাঁর ঘরের দরজায় প্রাণির ছবি যুক্ত পর্দা ঝুলানো আছে। তিনি আয়শা রা: কে নির্দেশ দেন যে ঐ পর্দা সরিয়ে তা কেটে উল্টো করে যেন বালিশের কভার বনানো হয়। তাই ছবি যুক্ত পোশাক পরিধান করে যেন আমরা নামায আদায় না করি বা সিজদার দিকের দেওয়ালে ছবি ঝুলানো আছে এবং সেই ছবি নামাজির দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে নামাজ আদায় করা উচিত নয়।

নামাযে একাগ্রতা আনার জন্য আমরা নামাজের বিষয়ে আলোচনা, নামাজে যা কিছু পড়ি তার প্রত্যেকটি আরবি আয়াত ও দোয়ার অর্থ বাংলায় লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। যাতে করে প্রত্যেক পাঠক লোক দেখানো বা মুনাফেকি নামাজ না পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জন্য নামাজ আদায় করতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ সুন্দর ও খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুণ।

নামাজ সংক্রান্ত কতিপয় কুরআনের আয়াত

আল কুরআনে বর্ণিত সালাতের নির্দেশনা,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

"যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কাযেম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।" (সূরা আল বাক্বারা, আয়াত : ৩)।

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।" (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৪৫)।

وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ

"(অথচ) এদের এছাড়া আর কিছুরই আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীন ও ইবাদত নিবেদিত করে নিবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে। কেননা, এটাই হচ্ছে। সঠিক জীবন বিধান।" (সূরা আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত : ৫)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ

"সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।" (সূরা মাউন, আয়াতঃ ৪-৫)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

"সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরা কাওছার, আয়াতঃ ২)

টীকা :

নামাজ সংক্রান্ত আরো কিছু কুরআনের আয়াত : সূরা-বাক্বারা: ৮৩,১১০, ১৫৩, ১৭৭, ২৭৭, ২৩৮, আত-তওবা: ৫, ১১, ১৮, ৫৪, ৭১, হজ্জ: ৩৫, ৪১, ৭৭, ৭৮, মরিয়ম: ৩১, ৫৫, হুদ: ১১৪, মাযেদা: ১২, ৫৫, আন আম: ১৬৩, আম্বিয়া: ৭৩, আরাফ: ২৯, আনফাল: ৩, নামল: ৩, ফুরকান: ৬৪, ফাতির: ১৮, ২৯, আল মমিনুন: ১-৪, আহযাব: ৩৩, আন নূর: ৩৭,৫৬, ত্বা-হা- ১৪, ১৩২, মরিয়ম: ৩১, ৫৫, লোকমান: ৪, ১৭, বনি ইসরাইল: ৩৮, ইব্রাহিম: ৩১, ৩৭, ৪০, জুম্মা: ১০, মাহমিন: ৬০।

১৭. নামাজের বাইরে ও ভিতরে তেরো ফরয

নামাজের বাইরে সাত ফরয :

১। শরীর পাক ২। কাপড় পাক ৩। নামাজের জায়গা পাক ৪। সতর ঢাকা ৫। কেবলামুখী হওয়া ৬। ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া ৭। নামাজের নিয়ত করা।

নামাজের ভিতরে ছয় ফরয :

১। তাকবিরে তাহরীমা বলা (আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধা) ২। দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ৩। কিরাত পড়া ৪। রুকু করা ৫। সিজদা করা ৬। আখেরী বৈঠক।

নামাজের ওয়াজিব ১৪টি :

১। সূরা ফাতিহা পড়া ২। সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা সর্বনিম্ন তিন আয়াত মিলানো ৩। রুকু সিজদায় দেরি করা ৪। রুকু হতে সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ানো ৫। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ৬। দুই রাকাতের পর বৈঠক ৭। উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ৮। ইমামের জন্য ক্বিরাত আস্তে বা জোরে পড়া ৯। বিতরের নামাজে তৃতীয় রাকাতে দোয়ায়ে কুনূত পড়া ১০। দুই ঈদের নামাজে ছয় বা বারো তাকবীর বলা ১১। প্রত্যেক ফরয নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পড়া সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলানো ১২। প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ১৩। প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ১৪। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে নামাজ শেষ করা।

নামাজের নিয়তের বিবরণ :

অন্তরের ইরাদা বা ইচ্ছাকে নিয়ত বলে। যেমন : আমি ফজর/ জোহর/ আছর/ মাগরিব/ এশার/ দুই/ তিন/ চার রাকাত ফরয/সুন্নাত/নফল নামাজের ইরাদা বা ইচ্ছা করলাম, আল্লাহু আকবার।

তাকবীরে তাহরীমা :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

"আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়"।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

"ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারচছামা ওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।"

'নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখমণ্ডলকে ঐ সত্তার দিকে ফিরিয়েঠি, যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।"

১৮. সানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

[সুহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারা কাছমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।]

"হে আল্লাহ আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। তোমার নামের বরকত ও মাহাত্ম সত্যই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সম্মান সকলের উচ্চে। তুমি ছাড়া অপর কেউ মাবুদ নেই।"

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

"তুমি বলে দাও: আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য।" সূরা আনআম-৬:১৬২)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

"অভিশপ্ত মরদুদ শয়তানের কবল হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"মেহেরবান-দয়াময় আল্লাহর নামে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝٢ مٰلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝٣ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۙ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝٧

সারাজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র ও সর্বপ্রকার তারীফ প্রশংসা। তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও মেহেরবান। তিনি বিচার দিনের মালিক। (যেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মের বিচার করা হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে।) হে মালিক! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সহজ, সোজা, সঠিক পথ দেখাও। তাদের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রাপ্ত। আর যারা অভিশপ্ত ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত নয়।

أمين আ-মী-ন। হে আল্লাহ! আমাদের দোআ কবুল কর, (মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।)

এরপর কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত পড়তে হয়। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই অমৃতে স্বাদে পরিপূর্ণ। তাতে অমূল্য উপদেশ, শিক্ষা এবং সত্য পথের দিকে আহ্বান রয়েছে। সূরা ফাতিহা যে সহজ ও সোজা পথের জন্য দোয়া করা হয়, তাতে সেই সোজা পথেরই হেদায়াত ও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

"কালের শপথ! সমগ্র মানুষ ধ্বংসের মুখে। কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমানদার এবং (ঈমানের দাবী অনুযায়ী) সৎকর্মশীল এবং যারা পরস্পর পরস্পরকে সত্য পথে চলতে উপদেশ ও পরামর্শ দেয় এবং সত্য পথে দৃঢ় ও মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে (কেবল তারাই ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা পেতে পারে)।" হকের উপর দৃঢ় থেকে যারা ধৈর্যধারণ করে।"

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .

[আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্চালা ওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু; আস-সালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন। আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।]

"আমাদের সব প্রশংসা, আমাদের সব নামাজ এবং সকল প্রকার পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আপনার ওপর আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রাসূল।

বিঃ দ্রঃ হে পাঠক! দুই রাকাত যদি নামাজ হয়, তাহলে তাশাহুদ পড়ার পর দরূদে ইব্রাহীম পড়ে দোয়ায়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হবে।

দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

[আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুমম্মাযীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুমম্মাযীদ।]

"হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর; যেমন রহমত নাযিল করেছিলে হযরত ইব্রাহীম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসারযোগ্য ও সুমহান। হে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ কর; যেমন তুমি অনুগ্রহ করেছ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি সর্বপ্রকার প্রশংসারযোগ্য এবং মহিমাময়।"

দরূদ পড়ার পরে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়ায়ে মাসূরাহ্ পাঠ করবেন।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

[আল্লাহুম্মা ইন্নী জলামতু নাফছী জুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুজুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্তাল গফুরুর রাহীম।]

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি। আর তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি তুমি রহম কর! তুমি তো ক্ষমাকারী দয়ালু।"

দোয়া কুনুত-১

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَنُثْنِی عَلَیْكَ الْخَیْرَ، وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ یَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّیْ وَنَسْجُدُ وَاِلَیْكَ نَسْعٰی وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

[আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতা ঈ'নুকা ওয়ানাছতাগফিরুকা ওয়ানু মিনুবিকা ওয়ানা তাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুছনী আ'লাইকাল খাইর, ওয়ানাশকুরুকা ওয়ালা-নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইয়্যাফ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুছাল্লী ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আ'যাবাকা ইন্না আ'যাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব।]

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই। তোমার কাছে আমাদের গুনাহের ক্ষমা চাই। তোমার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। আমরা কেবল তোমার উপরই ভরসা করি। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে তোমার প্রশংসা করি। আমরা তোমার শোকর আদায় করি। তোমার দানকে অস্বীকার করিনা। তোমার কাছে আমরা ওয়াদা করছি যে, তোমার অবাধ্য লোকদের সাথে আমরা কোন সম্পর্ক রাখবো না।

তাদেরকে পরিত্যাগ করবো। হে আল্লাহ, আমরা তোমার দাসত্ব স্বীকার করি। কেবল তোমার জন্য নামাজ পড়ি। কেবল তোমাকেই সিজদা করি। আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা সাধনা ও সকল কষ্ট স্বীকার কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্যই। আমরা কেবল তোমার রহমত লাভের আশা করি। তোমার আযাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আযাবে কেবল কাফেরগণই নিক্ষিপ্ত হবে।"

দোয়া কুনূত-২

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَّلَيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ (وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ) تَبَرَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

[আল্লা-হুম্মাদিনী ফী মান্ হাদাইতা, ওয়া আ-ফিনী ফী মান্ 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফী মান্ তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক্‌লী ফী মা আতাইতা; ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা, ফাইন্নাকা তাক্‌দী ওয়ালা ইউকদ্বা 'আলাইকা ইন্নাহু লা-ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়াইলাইতা ওয়াল ইয়ায়্যাযযুমান্ 'আ-দাইতা তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আ-লাইত।]

"হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছে, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছ, আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ; আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করে রেখেছ, তা হতে আমাকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারিত কর। তোমার উপরে তো কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারবে না। হে আমাদের প্রভু! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।"

নামাজ মানুষকে সকল খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে (আন কাবুত-৪৫)। নামাজ বেহেস্তের চাবি। নামাজ আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম; তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নামাজ পড়লে সে নামাজ অবশ্যই আল্লাহর নিকট কবুল হবে। সে নামাজ নামাজীর জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।

সে জন্য আল্লাহ বলেন,

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

"আমাকে ডাকো! আমি তোমাদের ডাকে অবশ্যই সাড়া দেবো।" (মুমিন- ৬০)

তাই বলে আমরা যখন নামাজ পড়বো নামাজের ভিতরে ও বাইরে অর্থ বুঝে নামাজ পড়বো। ভুলক্রমে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নামাজে মন অন্য দিকে চলে গেলে (বা ধাবিত হলে) মনকে পুনরায় নামাজে নিয়ে আনাই মুমিনের নামাজ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক ও সহীহভাবে আল্লাহকে রাজি খুশি করে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন।

নামাজ সম্পর্কে কিছু হাদীস

নামাজ না পড়া কুফুরির নামান্তর

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফুরি করল"।

"বান্দা ও কুফুরির মধ্যে ব্যবধান হল নামাজ ছেড়ে দেয়া।" রাসূল (সা.) বলেন, "আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজের ব্যাপারে ওয়াদা। যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে কুফুরি করল।" নবী কারিম (সা.) এর সাহাবীগণ নামাজ ছেড়ে দেয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজকে কুফুরী মনে করতেন না। (তিরমিযী) অর্থাৎ তারা মনে করতেন- কাফেররাই কেবল নামাজ ত্যাগ করে থাকে।

কুফুরি করার অর্থ

হাদীসে বলা হযেছে:- যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ছেড়ে দিল সে কফুরি করল।"

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, নামাজ ছেড়ে দিলে একজন মুসলমান কাফের হয়ে যায়, এ কথার অর্থ কী? হয়ত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) এরশাদ করেন,

مَنْ تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اسْمُهُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فِيْمَنْ يَّدْخُلُهَا .

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামাজ ছেড়ে দিল; তার নাম জাহান্নামের দরজায় জাহান্নামে প্রবেশকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে লিখা হয়।"

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, কুরআনে কারীম থেকে হেদায়ত লাভের জন্যে মুত্তাকীদের ছয়টি গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নামাজ কায়েম করা একটি শর্ত। বলা হয়েছে যারাই নামাজ কায়েম করবে, তারাই কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে।

নামাজের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মসজিদের ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহর নবী (সা.) এর হাদীসটি দেখুন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْمَلَائِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْهُ لَايَزَال اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاةٍ مَّادَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهٗ لَا يَمْنَعُهٗ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا الصَّلَاةَ .

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেন যখন কোন ব্যক্তি ওযু সহকারে নামাজের অপেক্ষায় মুসাল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি ওকে মাফ করে দাও, তার ওপর রহম কর! আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাজই তাকে বাড়িতে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাজরত আছে বলে গণ্য হবে। (সহীহ বুখারী ৬৫৯ নং হাদীস)

اَلصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

নামাজ বেহেস্তের চাবি

مِفْتَاحُ الصَّلَاةُ الْوُضُوء

আর অযু সালাতের চাবি।" (তিরমিযি)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

"তোমরা ঠিক সেভাবে নামাজ পড়, যে ভাবে পড়তে দেখেছো আমাকে।" (সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমদ)।

সন্তানদের প্রতি সালাত আদায়ের নির্দেশ ও সালাতের ফযীলত

عَنْ عُمْرُوْ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِىْ الْمَضَاجِعِ .

আমর ইবনে শুয়াইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও যখন তারা সাত বছরে উপনীত হয়। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার কর, আর তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ ১ম খন্ড, সালাত অ: পৃ: ২৭২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اَللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالُوْا : لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا .

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটা প্রবাহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল (সা.) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظُ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا بُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَّهُ نُوْرًا وَّ لَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ ابْنُ خَلَفٍ .

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাত আদায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন- "যে ব্যক্তি সালাতের সঠিকভাবে হিফাজত করবে, তার এই সালাত কিয়ামতের দিন তার জন্যে আলো, দলিল ও মুক্তির কারণ হবে। যে তার সঠিক হিফাজত করবে না, তার জন্যে সালাত কিয়ামতের দিন আলো, দলিল কিংবা মুক্তির কারণ হবে না। আর ঐ ব্যক্তি হাশরের দিন কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের ন্যায় কাফিরদের সাথে উঠবে।" (আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী)

সালাত মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী

عَنْجَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ .

জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "বান্দা (ঈমানদার) ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।" (সহীহ মুসলিম)

জামায়াতে সালাতের ফযীলত

عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ.

ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "যে ব্যক্তি এশার সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে, সে যেন অর্ধ রাত্রি সালাত আদায় করেছে। অতপর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করেছে, সে যেন পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায় করেছে।" (মুসলিম ২য় খণ্ড, অ: সালাত পৃ: ৩৪৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "জামায়াতের সাথে সালাত আদায়কারী একাকী সালাত আদায়কারী থেকে সাতাশ গুণ বেশি ফযীলতের অধিকারী।" (বুখারী-মুসলিম)

১৯. জুমু'আর নামাজের বিবরণ

প্রথম হিজরিতে জুমু'আর নামাজ ফরজ হয়। হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের কানুনা উপত্যকায় সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) জু'মুআর সালাত আদায় করেন। জুমু'আর দিনে সকল সৃষ্টি কর্ম সম্পন্ন হয় এবং সর্বশেষ সৃষ্টি হিসাবে আদমকে সৃষ্টি (পয়দা) করা হয়। তাই এই দিনটি হলো সকল দিনের সেরা। বৎসরে শ্রেষ্ঠ দিন হলো আরাফার দিন। মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস হলো রমযান মাস। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ হলো জুমু'আর দিন। এই দিনটি মুসলিম উম্মাতের ইবাদতের দিন হওয়ায় বিগত সকল উম্মতের উপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এ নামায মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সামাজিক মেরুদণ্ড দৃঢ়করণের এক চিরন্তন ব্যবস্থা।

সেখানে মুসলমানগণ মিলিত হয়ে যেমনি আল্লাহর ইবাদত করবে, তেমনি দেশ, জাতি তথায় বিশ্বের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ এবং তার প্রেক্ষিতে বাস্তব কর্মনীতি গ্রহণ করবে।

ফযীলতঃ

জুমুআর দিন হ'লো 'দিন সমূহের সেরা'। এদিন আল্লাহর নিকটে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চাইতেও মহিমান্বিত। এইদিন নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ, আকাশ, পৃথিবী, বায়ু, পাহাড়, সমুদ্র সবই কিয়ামত হবার ভয়ে ভীত থাকে'। জুমুআর রাতে বা দিনে কোন মুসলিম মারা গেলে আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা হতে বাঁচিয়ে দেন। এইদিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এইদিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এইদিন তাঁকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এদিনে তার তওবা কবুল হয় এবং এদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এইদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে বেশি বেশি দরূদ পাঠ করতে হয়। এই দিন ইমামের মিম্বরে বসা হ'তে জামা'আতে সালাত শেষে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এমন একটি সংক্ষিপ্ত সময় রয়েছে, যখন বান্দার যেকোন সঙ্গত প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন।

জুমু'আর আযান :

খত্বীব ছাহেব মিম্বরে বসার পরে মুওয়াযিন জুমু'আর আযান দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা.), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রা.)-এ খেলাফতের প্রথমার্ধ্বে এই নিয়ম চালু ছিল। অতপর মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে হযরত ওছমান (রা.) জুমু'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে যাওরা' বাজারে একটি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে লোকদের আগাম হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন। খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িকভাবে নির্দেশনা।

খুৎবাঃ

জুমু'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত। যার মাঝখানে বসতে হয়। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবুবকর ও ওমর (রা.) এটি নিয়মিত করতেন। আবু হানীফা ও মালেক (রহঃ) প্রমুখ মসজিদে প্রবেশকালে সালাম করাকেই যথেষ্ট বলেছেন। খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন। নিতান্ত কষ্টদায়ক না হলে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হামদ, দরূদ ও কিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন। অতপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন। প্রয়োজনে এই সময়ও কিছু নছীহত করা যায়।

জুমু'আর নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বলেন-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"হে ঈমানদারেরা! জুমু'আর দিন যখন নামাজের জন্যে ডাকা হবে। তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ কর। আর এই হল তোমাদের জন্য সর্বোত্তম; যদি তোমরা জানতে।" (সূরা জুমুয়া-৯)

জুমু'আর নামাজ সম্পর্কে হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, "সূর্যোদয় হওয়া দিন সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমু'আর দিন। জুম্মুআর দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে তৈরী করা হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এদিনেই তাঁকে বেহেশত হতে বের করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আর কিয়ামত জুমু'আর দিনেই অনুষ্ঠিত হবে।" (মুসলিম)।

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْيَوْمِ وَالْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اِلَّا مَرِيْضٌ اَوْ مُسَافِرٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (دار قطنى)

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখে, তার অবশ্যই জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাজ আদায় করা কর্তব্য। তবে রোগী, মুসাফির, মহিলা, শিশু, পাগল ও ক্রীতদাস এ কর্তব্য হতে মুক্ত। যদি কোন লোক খেল-তামাশা কিংবা ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত হয়ে এ নামাজ হতে গাফেল থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তার ব্যাপারে বিমুখ থাকবেন। আর আল্লাহ হলেন মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত।" (দারে কুতনী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَايُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْئَلُ اللّٰهُ مِنْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ (بخارى – مسلم)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন, "অবশ্য জুমু'আর দিন এমন একটা সময় আছে, যখন কোনো মুসলিম বান্দাহ আল্লাহর কাছে কল্যাণকর কিছু কামনা করবে; অবশ্যই তাকে তা দেয়া হয়।" (বুখারী, মুসলিম)

২০. ঈদের নামাজ

ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হা দুই ঈদের নামাজই ফজরের দুই রাকাত ফরয নামাজের মত। অতিরিক্ত ৬ তাকবীর হানাফী ও ১২ তকবীর অন্য মাযহাবে (১২/৬) বার/ ছয় তাকবীর সহকারে পড়তে হয়। নামাজের শেষে খুৎবা শুনা ওয়াজিব।

ঈদের তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

“আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান এবং আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।” (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধবেন। তাকবীরে তাহরীমার পর মুসল্লিরাও ইমামের সাথে আল্লাহু আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন আর ছাড়বেন। এরূপ ৭বার বা ৩ বার করবেন এবং ইমামের আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে হাত উঠাবেন ও তাকবীর বলবেন। শেষ তাকবীরে হাত বেঁধে

ফেলবেন। তখন ঈমাম সাহেব সুরা ফাতিহা ও কিরাত পাঠ করে রুকু-সিজদা করে ১ম রাকাত সমাপ্ত করে ২য় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন। ২য় রাকাতের শুরুতে ঈমাম সুরা ফাতেহা ও কিরাত পাঠ শেষে প্রথম রাকাতের প্রারম্ভের ন্যায় ৬ বার বা ৩ বার তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে এবং এর পর সেজদা করে তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করে নামাজের সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাপ্ত করে ইমাম খুৎবা দিবেন।

দু'ঈদের নামাজ হিজরী ২য় সনে চালু হয়। দুই ঈদ হল মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বার্ষিক দুটি আনন্দ উৎসবের দিন। এই দু'টি উৎসব হবে পবিত্রতাময় ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। প্রাক্ ইসলামি যুগে আরব দেশে অন্যদের অনুকরণে নববর্ষ ও অন্যান্য উৎসব পালনের রেওয়াজ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরত করার পরে দেখলেন যে মদীনাবাসীগণ বছরে দু'দিন খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব করে। তখন তিনি তাদের বললেন, "ক্বাদ আব্দালাকুমুল্লাহু বিহিমা খাইরান মিনহা ইয়াওমূল আদ্বহা ওয়া ইয়াওমূল ফিত্রি"। "আল্লাহ তোমাদের ঐ দুই উৎসবের দিনের বদলে দু'টি মহান উৎসবের দিন প্রদান করেছেন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।" (আবু দাউদ ও মিশকাত - ১৪৩৯)। দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের ৩ দিন সিয়াম পালন নিষিদ্ধ। (বুখারী, মুসলিম)

দুই ঈদ ইসলামের প্রকাশ্য ও সেরা নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সূর্যোদয়ের পর সকাল সকাল খোলা ময়দানে গিয়ে ঈদের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনার মসজিদে নববীর বাইরে খোলা ময়দানে "বাত্বহান" প্রান্তরে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। একবার বৃষ্টির কারণে মসজিদে নামাজ আদায় করেছিলেন। জুমু'আ ও ঈদ একই দিনে হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হিসেবে দু'টিই পড়েছেন। অন্যদের মধ্যে যারা ঈদের নামাজ পড়েছেন তাদের জন্য জুমু'আর নামাজ অপরিহার্য করেননি। জামে মসজিদ থেকে বাসা খুব দূরে অবস্থিত না হলে জুমুআর নামাজ আদায় করাই উত্তম। আর যদি বাসা খুব দূরে হয় তা হলে জুমুআর দিন ঈদের নামায আদায় করলে জুমুআর নামাজ আদায় না করে যোহরের নামাজ আদায় করা যাবে।

অতিরিক্ত তাকবীর সমূহঃ

১। আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে ১ম রাকাতে সাত ও ২য় রাকাতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। রুকুর দুই তাকবীর ও তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত। (উক্ত হাদিসটি আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাকীতে বর্ণিত হয়েছে)।

২। আমর ইবনু শুআইব (রা.) তার পিতা হতে তিনি তার দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত প্রথম রাকাতে ৭টি ও শেষ রাকাতে ৫টিসহ মোট ১২টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে নামাজের তাকবীর ব্যতীত। (বায়হাকী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

৩। কাছীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই ঈদের ১ম রাকাতে কিরাতের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং ২য় রাকাতে কিরাতের পরে ৫ তাকবীর দিতেন। (জামে তিনমিযী, মিশকাত, ইবনে মাজাহ)।

২১. যানাযার নামাজ

জানাযার নামাজের নিয়ম

জানাযার নামাজ ফরযে কিফায়া। ৪ (চার) তাকবিরের সাথে আদায় করতে হয়। প্রথম তাকবির (তাকবিরে তাহরিমা), আল্লাহু আকবার বলে–اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অতপর সানা পড়তে হবে-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ .

প্রথম তকবীরে সানা পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করা হানাফী ফকীহগণ প্রয়োজন মনে করেন না। সানা পাঠ করার পরই হানাফীগণ দ্বিতীয় তকবির দিয়ে দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করেন এবং তৃতীয় তকবীরের পর মাইয়্যেতের জন্য নির্ধারিত দোয়া পাঠ করে চতুর্থ তকবীর দিয়ে সালাম ফিরিয়ে জানাজা নামায শেষ করেন।

তবে কোন কোন মাযহাবের ফকীহগণ জানাযা নামাজে সানা পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন না। তারা জানাযা নামাযে প্রথম তকবীরের পর সরাসরি সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব মনে করেন। কারণ তারা মনে করেন, জানাযা নামাজ হলো মাইয়্যেতের জন্য দোয়া। তাই সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক।

কোন কোন ফকীহগণ জানাযা নামাযে প্রথম তকবীরের পর সানা এবং সূরা ফাতিহা উভয়টি পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন।

তবে সকল মাযহাবেই দ্বিতীয় তকবীরের পর দরূদে ইব্রাহীম ও তৃতীয় তকবীরের পর নির্ধারিত দোয়া পাঠ করে চতুর্থ তকবীরের পর সালাম ফিরানো হয়।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

[আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুমম্মাযীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়াআ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুমম্মাযীদ।]

"হে আল্লাহ তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর। যেমন রহমত নাযিল করেছিলে হযরত ইব্রাহীম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসারযোগ্য ও মহান। হে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমন তুমি অনুগ্রহ করেছ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি সর্বপ্রকার প্রশংসারযোগ্য এবং মহিমাময়।"

৩য় তাকবীরের পর (আল্লাহুম্মাগফিরী) দোয়া পড়বেন

অতপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

"হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যারা জীবিত আছে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমাদের মাঝে। যারা উপস্থিত আছে ও অনুপস্থিত আছে, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলকেই তুমি ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের মাঝে যারা জীবিত আছে সকলকেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আর আমাদের মাঝে যারা মৃত্যুর মুখে আছে তাদের সকলকেই ঈমানের ওপর মৃত্যু দিও। হে আল্লাহ! তাকে তুমি ক্ষমা কর এবং তার ওপর তোমার রহমত বর্ষিত কর, নিশ্চয়ই তুমি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল।"

২২. রোজা বা সিয়াম اَلصَّوْمُ

সিয়াম আরবী শব্দ, বাংলা ও ফারসি ভাষায় রোজা। এর অর্থ বিরত থাকা, দূরে থাকা, অবিরাম চেষ্টা ও আত্মসংযম।' ইসলামী পরিভাষায় সুবহে সাদিক হতে- সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী যৌন মিলন হতে নিজেকে বিরত রাখার নাম রোজা। পূর্বেও যুগে যুগে আসমানী কিতাবের অনুসারীদের উপর রোজা ফরজ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পরে মদীনায় ইহুদীদের মধ্যে আশুরার (মহরমের ১০ তারিখ) রোজা পালন দেখে হিজরতের ১৮ (আঠার) মাস পরে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর শাবান মাসে রোজা ফরজ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। এরপর হতে আশুরা বা মহররমের রোজা পালনের অপরিহার্যতা বা ফরজিয়াত বাতিল হয়ে যাওয়ার পর পর রমজানের রোজা ফরজ হয়। রমজানের রোজা ফরজ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল। সম্ভবত এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।" (সূরা বাকারা : ১৮৩)

রমজান মাস মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বড় নিয়ামত। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য রোজার বিধান চালু করেছেন। এ মাসকে বাকী ১১ মাসের উপরে কুরআন নাযিল এর মাস হিসেবে বিশেষ বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের গুণাহ মাফ করে মৃত্যুর পরে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে রোজা তৃতীয় স্তম্ভ। যার ঈমান যত মজবুত তার নামাজ মজবুত, তার রোজা তত মজবুত রোজা আল্লাহর পক্ষ হতে ১টি ফরজ ইবাদত। এ মাস নেকী ইনকাম করার মৌসুম। এ মাসে দয়া, রহমত, বরকত ও মাগফেরাতে ভরপুর। যারা সারা জীবনে শুধু গুনাহের

কাজে লিপ্ত ছিল, ভালো কাজ করা তাদের ভাগ্যে জুটে নাই, তাদেরকে তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য রোজার ইবাদত আল্লাহর পক্ষ হতে একটি বিশেষ মেহেরবানী ও সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ যারা কাজে ও আমলে পরিণত করবে, তারা মৃত্যুর পরে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। এ মাস সবর ও ধৈর্যের মাস ধৈর্য্যে বদলা জান্নাত। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাস হতে উত্তম। এ রাতটি বৎসরের রাজা। এ মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এ মাসের গুরুত্ব অনেক বেশি।

এ মাসে একটি নফল ইবাদত অন্য মাসে একটি ফরজ ইবাদতের সামান। এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত অন্য মাসের ৭০টি ফরজ ইবাদতের সমান। এ মাসের ইবাদতের সওয়াবের পুরস্কার আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে বান্দাকে দিবেন।

সকল শ্রেণির মানুষের জন্য (ঈমান) কলেমা নামাজ ও রোজা ফরজ। আবার ধনী ও বিত্তবান লোকদের জন্য হজ্জ ও যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন।

একজন ঈমানদার ব্যক্তি ঈমান আনার পরে আল্লাহর সকল নির্দেশ সক্রীয়ভাবে পালন করবে এটাই ঈমানের দাবী। আমাদের সমাজে অনেক মুসলমান আছে, তারা অন্য মাসে নামাজ আদায় করে না। কিন্তু রোজার মাসে আল্লাহ ভক্ত হয়ে নামাজ ও রোজা দু'টিই আদায় করে, কারো ধূমপান ও অন্যান্য খারাপ অভ্যাস থাকলে দিনের বেলায় তা বর্জন করে চলে। রোজার মাস শেষ হয়ে গেলে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেয় এবং পুনরায় ধূমপান ও খারাপ অভ্যাস আরম্ভ করে দেয়। এ ধরনের লোকদের তাকওয়ার গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাকওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং আল্লাহর আযাব জাহান্নাম হতে বেঁচে থাকা। যারা রমজান মাসে পেয়ে তা হতে তাকওয়ার গুণ অর্জন করে তারা কখনো নামাজ ত্যাগ করতে পারে না। মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য নামাজ। আমার পীর হুজুর অথবা আমার বাবা তাকওয়াবান ব্যক্তি; এ কথা বলে জান্নাতে যাওযার কোন সুযোগ নাই। আমাকেও তাকওয়াবান ব্যক্তি হতে হলে আমল করে তা অর্জন করতে হবে।

২৩. তাকওয়া অর্জনই রোজার উদ্দেশ্য

আল্লাহকে ভয় করে চলার নাম তাকওয়া। আর এটাই রোজার উদ্দেশ্য। মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহর বন্দেগিতে পরিণত করাই হচ্ছে– ইসলামের আসল উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে চিন্তা করা উচিত কিসে আল্লাহ খুশি হন; আর কিসে অসন্তুষ্ট হন; সকলকে আল্লাহর সন্তোষজনক কাজ করা উচিত এবং অসন্তোষজনক কাজ পরিহার করা উচিত।

(১) রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে রোজা ভেঙ্গে যায় এমন কোন কাজ করে না।
(২) কঠিন পিপাসায় কলিজা ফেটে যাবার উপক্রম হলেও এক ফোটা পানি পান করে না।
(৩) ক্ষুধার কারণে চোখে তারা ফুটতে শুরু করলেও কোন কিছু খাবার ইচ্ছা করে না।
(৪) পরকালে যেখানে হিসাব নেয়া হবে, সেখানকার কথা, রোজাদার ভুলে থাকতে পারে না।

এভাবে তাকওয়ার সৃষ্টি হয়। আল্লাহকে আলেমুল গায়েব মনে করে গোপনেও কেউ আল্লাহর আইন ভঙ্গ করতে পারে না। নামায কয়েক মিনিটের ইবাদত। যাকাত বছরে একবার আমল করার ইবাদত। হজ্জ দীর্ঘ সময় লাগলেও জীবনে মাত্র একবার করার ইবাদত। তাও সকলের জন্য নয়, কেবল ধনীদের জন্য। কিন্তু রোজা সকলের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ইবাদত। শেষ রাতে সাহরী খাওয়া, দিনের বেলায় খানাপিনা

সব বন্ধ করা, সন্ধ্যায় ইফতার করা, একটু আগেও নয়, একটু পরেও নয়। ইফতারির পরে বিশ্রাম বাদ দিয়ে লম্বা ইবাদত-তারাবীর নামায আদায় করা। একজন সিপাহীর মতো এক মাস ট্রেনিং দিয়ে সারা বছর ট্রেনিং কাজে লাগানোর মতো রোজা একটি ইবাদত। রমজান শেষ হবার পর তাকওয়ার প্রভাব সারা বছর আমলে জারি থাকতে হবে।

খাবার পর পরই বমি করলে খাবার কোনো উপকারে লাগে না। ঠিক তেমনি ঈদুল ফিতরের দিনই রোজা বমি করে ফেলে দিলে, সারা বছর কোনো কাজে লাগবে না। রোজার এ শিক্ষাকে ধারণ করে বছরের বাকী ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে।

রমজানের রোজা ফরজ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছিল। সম্ভবত এর ফলে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে।" (সূরা বাকারা : ১৮৩)

এই আয়াতে রোজা ফরজ করার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বলা হয়েছে। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন।

২৪. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়ার অর্থ :

তাকওয়ার মূল শব্দের অর্থ বাঁচা। আল্লাহ বলেন :

فَوَاقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

"আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছেন।"

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো, ভয় করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সকল আদেশ মানা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তার আদেশ নিষেধ মানতে হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার চেষ্টা করতে হবে। ফলে সকল ফরজ ওয়াজিব পালন করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে তাকওয়া। সকল আলেম, মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ তাকওয়ার এই অর্থই বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন : "তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তার নাফরমানী না করা; আল্লাহকে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরি না করা।"

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহ) বলেছেন : "দিনে রোজা রাখা কিংবা রাত্রে জাগরণ করা অথবা দু'টোর আংশিক আমলের নাম তাকওয়া নয়। বরং তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহ যা ফরজ করেছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।"

তাকওয়া অর্জনের জন্য কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দরকার। সে জন্য কুরআন ও হাদীস পড়তে হবে, বুঝতে হবে ও সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যারা কুরআন হাদীস পড়ে না, তাদের পক্ষে তাকওয়া অর্জন খুবই কষ্টকর।

তাকওয়ার ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে। কিছু লোক আছে, যারা ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব ও হারাম কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল নয়। তারা বিশেষ কিছু সুন্নত ও নফল কাজ করে নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং অন্যদেরকে মুত্তাকী নয় বলে মনে করেন। তারা হাতে তাসবীহ, মাথায় টুপি-পাগড়ী, মুখে লম্বা দাঁড়ি, গায়ে লম্বা জামা এবং পেশাব-পায়খানায় ঢিলা ব্যবহার করাকে তাকওয়ার মাপকাঠি মনে করেন। অথচ এগুলো সুন্নত ও মুস্তাহাব, ফরজ নয়।

কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অগণিত ফরজ-ওয়াজিব রয়েছে, যেগুলো তারা পালন করেন না। সেগুলোর খবরও রাখেন না। যেমন, পর্দাহীনতা, সুদ, ঘুষ ইতাদির ব্যাপারে উদাসীন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ, দাওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে ও ইকামতে দ্বীনের কাজে বেখবর। এক ধরনের ভণ্ড পীর-ফকীর ও দরবেশ আছে, যারা বহু অনৈসলামী কাজ করেও নিজেদেরকে মুত্তাকী এবং আল্লাহর প্রেমিক বলে প্রকাশ করে। তাদের হাতে তাসবীহ ও লাঠি, মুখে গাঁজা ও দাঁড়ি এবং পরনে বিভিন্ন ধরনের কাপড় থাকে, কবর পূজা তাদের প্রধান কাজ। এগুলো তাকওয়া তো দূরের কথা; বরং তার থেকে হাজার মাইল দূরের জিনিস। তাকওয়া বিরোধী জিনিস। কেননা, তাকওয়ার অর্থ হলো, সকল ফরজ-ওয়াজিব মানা এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে, তারা হারাম কাজগুলো সব করে এবং ফরজ-ওয়াজিব থেকে দূরে থাকে। এরা দোযখের ইন্ধন হবার কাজে জড়িত হয়ে আছে।

তাকওয়ার উদাহরণ

ওমর বিন খাত্তাব (রা.) উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা.) বলেন: "আপনি কী কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? ওমর (রা.) বলেন, হ্যাঁ। উবাই (রা.) বলেন, কীভাবে চলেছেন? ওমর (রা.) বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে, সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই (রা.) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।"

হযরত উবাই বিন কা'বের (রা.) মতে তাকওয়ার উদাহরণ হচ্ছে কন্টকাকীর্ণ সরু গিরিপথে চলা। যার দুই দিকেই কাঁটা। যে পথে সাবধানে না চললে গায়ে কাঁটা লাগার সম্ভাবনা আছে। সমাজে হারাম, নিষিদ্ধ কাজ এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসাকে কাঁটার সাথে তুলনা করা যায়।

তাকওয়াকে বাইম মাছের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাদার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে কাদা লাগে না। একজন মুমিনও সমাজে পাপ-পঙ্কিলতা এবং আল্লাহর নাফরমানির কলুষিত পরিবেশে বাস করা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন। এভাবেই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন : "সম্ভবত তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা থাকলে, তা অর্জন করা সম্ভব। যাদের চেষ্টা নেই, তারা তা অর্জন করতে পারে না। অন্যদিকে, যারা রোজার মাধ্যমে নিজেদের জীবন ও আমলে পরিবর্তন এনেছেন এবং যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা শুরু করেছেন, তারাই রমজানের মূল উদ্দেশ্য-তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের জন্যই রয়েছে রমজানের অনেক পুরস্কার। হাদীসে রোজাদারের জন্য সে সকল ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তারাই তা লাভ করবেন।

২৫. রোজার ফযীলত

রমজানের রোজার ফজীলত অনেক। ইসলামে যে সকল এবাদতের সওয়াব ও পুরস্কার সর্বাধিক তার মধ্যে রমজানের রোজা অন্যতম। অন্য কোনো এবাদতের ফযীলত এতো কমই বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা রমজানের রোজার ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করবো।

হযরত আবু হারায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ.

"যে ঈমান ও এহতেসাবের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমজানের রোজা রাখবে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।" (বোখারী ও মুসলিম)

আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ গুণ পর্যন্ত-সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোজা এর ব্যতিক্রম। সে একমাত্র আমার জন্যই রোজা রেখেছে এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরষ্কার দেবো। সে আমার জন্যই যৌন বাসনা ও খানা-পিনা ত্যাগ করেছে। রোজাদারের রয়েছে দুটো আনন্দ। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোজাদারের মুখের উপবাস জনিত গন্ধ মেশক-আম্বরের সুঘ্রাণের চাইতেও উত্তম।' (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের আরেকটি অর্থ আছে। আর 'তা' হলো, আল্লাহ নিজেই রোজার পুরস্কার হবেন। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি ও সাক্ষাত লাভ করা যাবে। তখন হাদীসটি হবে-

وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ অর্থ ঃ "আমি নিজেই এর বিনিময়।"

এই হাদীসে অন্যান্য এবাদতের সাওয়াবের পরিমাণ উল্লেখ করে রোজাকে ভিন্নধর্মী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তিনি নিজ হাতে রোজার সাওয়াব দান করবেন এবং সেটা হবে প্রচলিত হিসেবের চাইতে অনেক বেশি।

অর্থাৎ আল্লাহ রোজাদারকে রোজার জন্য অনেক বেশি সাওয়াব, পুরস্কার ও বিনিময় দান করবেন।
হযরত সাহল বিন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) এরশাদ করেছেন: 'বেহেশতে রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে। রোজাদার ছাড়া আর কেউ সেই দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। রোজাদাররা প্রবেশ করলে তা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।' (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)।
রোজার বিশেষ ফজিলত হচ্ছে বেহেশতের রাইয়ান দরজা। 'এটা' রোজাদারের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। 'রাইয়ান' শব্দটি আরবী رَيٌّ থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো, চূড়ান্ত তৃপ্তি সহকারে পান করা। 'রোজাদাররা বেহেশতে প্রবেশের পর সুস্বাদু পানীয় পান করবে, যার ফলে কোনো দিন তারা তৃষ্ণার্ত হবে না'।

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সিঁড়িতে পা রেখে তিনবার আমীন বললেন। তন্মধ্যে একটি হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত (কপাল পোড়া) যে, রমজান পাওয়া সত্ত্বেও গুনাহ মাফ করে নিতে পারেনি।

(২) যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। জান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল পরানো হয়। (মুত্তাফাকুন আলাইহে)

(৩) আল্লাহ জান্নাতকে এ মাসে নির্দেশ দেন, আমার বান্দাহদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হও। শীঘ্রই, তারা দুনিয়ার দুঃখকষ্ট থেকে আমার ঘরে সম্মানের সাথে বিশ্রাম নিবে।

আবু জার গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -"আমি শুনেছি বান্দারা যদি জানতো যে রমজান কি? তাহলে আমার উম্মত পুরো বছর, রমজান অব্যাহত থাকার আকাংখা পোষণ করতো।"

২৬. দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোজা

একজন মুসলমানের ২৪ ঘণ্টাই ইবাদত। যদি তার প্রত্যেকটি জায়েজ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় (বিসমিল্লাহবলে শুরু করা হয়)।

একজন অমুসলিম (কালেমা) শাহাদা মুখ, জিহ্বা দ্বারা স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামের ফরজ ইবাদত, নামাজ ও রোজা পালন করে থাকে। সকল মুসলিমের ৩½ হাত বডিকে আল্লাহর আযাব ভোগ করতে হবে যদি সে দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর হুকুম অমান্য করে থাকে।

এ আযাব বা শাস্তি ৩½ হাত Body এর প্রত্যেকটি অঙ্গকে ভোগ করতে হবে। সে Body বা শরীরের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জিহ্বা। মবজুত ঈমান, বিশুদ্ধ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রোজা পালন করলে জিহ্বা কর্তৃক অর্জিত সকল গুণাহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখা সম্ভব।

একজন রোজাদারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জিহ্বা

১. জিহ্বার রোজা : প্রথম অঙ্গ

ইসলামে মুখের কথার গুরুত্ব অনেক বেশি। জিহ্বা হচ্ছে কথা বলার বাহন বা হাতিয়ার। তাই জিহ্বাকে সংযত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রোজার ক্ষেত্রে এই সংযম আরো বেশি দরকার। মহান আল্লাহ বলেছেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

"কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমান পর্যবেক্ষক লেখার জন্য প্রস্তুত থাকে।" (সূরা কাফ-১৮)

জিহ্বার হেফাজতের গুরুত্ব

মানুষের উচ্চারিত সকল শব্দের তদারক করা হয় এবং সেজন্য হিসেব দিতে হবে। তাই কথা বলার সময় বিবেচনা করতে হবে। ভালো কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা যাবে না।

কুরআনে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করাকে মুমিনের বিশেষ গুণ আখ্যায়িত করা হয়েছে মহান আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○

"(তারাই মুমিন) যারা অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকে।"-(সূরা আল-মুমিনুন-৩)

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মুআজ (রা.)-কে বললেন: হে মুআজ এটাকে (জিহবাকে) সংযত রাখো। এ কথা বলে তিনি নিজ জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন মুআজ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল কথা বলি, সেগুলোর ব্যাপারেও কি আল্লাহ পাকড়াও করবেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সর্বনাশ, হে মুআজ! জিহ্বার খারাপ ফসল হিসেবেই মানুষকে তার নিজ - চেহারার উপর উপুড় করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।' (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত সাহল বিন মুআজ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا فَخِذَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةُ ○

"যে আমাকে তার দুই ঠোঁট ও দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থানের নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার বেহেশতের নিশ্চয়তা দেবো।" (বুখারী)।

এই হাদীসে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই দুই স্থানকে হেফাজত করলে বেহেশত পাওয়া যাবে।

মূলত এই দুটো জিনিস খুবই বিপজ্জনক এবং শয়তানের বড় হাতিয়ার। জিহ্বার কারণেই মানুষ কষ্ট পায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "সেই ব্যক্তি মুসলমান, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

"পক্ষান্তরে যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়।" প্রবাদ আছে, কথার ঘা শুকায় না, মারের ঘা শুকায়। তাই জিহ্বার ব্যাপারে সর্বাধিক সর্তক থাকতে হবে।

কথা কম বললে ভুল কম হবে এবং অপরাধ বাড়বে না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেনো কথা বললে ভালো কথা বলে, কিংবা চুপ করে থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের মর্মানুযায়ী ভালো কথাই বলা উচিত। আর ভালো কথা না থাকলে চুপ করে থাকা উচিত।

জিহ্বার ১৫টিরও বেশি দোষ আছে। সেগুলো জিহ্বা ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না। সেগুলো হচ্ছে : ১. মিথ্যা বলা ২. খারাপ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ৩. অশ্লীল ও খারাপ কথা বলা ৪. গালি দেয়া ৫. নিন্দা করা ৬. অপবাদ দেয়া ৭. চোগলখুরী করা ৮. বিনা প্রয়োজনে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া ৯. মুনাফেকী করা ও দুই মুখে কথা বলা ১০. ঝগড়া-ঝাটি করা ১১. হিংসা করা ১২. বেহুদা ও অতিরিক্ত কথা বলা ১৩. বাতিল ও হারাম জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা। ১৪. অভিশাপ দেয়া ১৫. সামনা-সামনি প্রশংসা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

لَيْسَ الصِيَامُ مِنَ الطَّعَامُ وَالشَرَابِ اِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرُّفَثِ ○

"কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই রোজা নয়, বরং রোজা হচ্ছে, বেহুদা কথা ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত থাকা।" (ইবনে হিব্বান) হাফেজ আবু মূসা আল মাদানী বলেছেন, হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) রোজাকে জিহ্বার অনিষ্ট থেকে বিশুদ্ধ রাখার পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন :

اِذَاأَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ اِنِّيْ صَائِمٌ "○

"তোমাদের কেউ রোজা রাখলে সে যেনো গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয়, কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে-যেনো বলে দেয়, আমি রোজা রেখেছি, আমি রোজাদার।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতিই জিহ্বার অপরাধ থেকে বাঁচার উত্তম মাপকাঠি। অর্থাৎ কেউ তাকে খারাপ কাজে জড়াতে চাইলে, সে জড়িয়ে যাবে না। বরং এড়িয়ে যাবে। যে ব্যক্তি জিহ্বার লাগাম খুলে দেয়, তার রোজা কীভাবে হয়? যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলে ও কথার মাধ্যমে ধোঁকা দেয়, তার রোজার অর্থ কী দাঁড়ায়? যে ব্যক্তি পরনিন্দা করে, গালি দেয় ও অন্যকে কষ্ট দেয়, তার রোজার ফলাফল কী হবে? এ সকল রোজা সবই নষ্ট এবং বাতিল।

কত লোক আছে জিহ্বার অনিষ্টতার কারণে তাদের সকল রোজা নষ্ট হয়ে যায়। রোজার উদ্দেশ্য তো শুধু উপোস থাকা নয়। বরং রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে– আদব, শিষ্টাচার ও সংযম শিক্ষা করা এবং তার প্রয়োগ করা। তাই রোজাদারের মুখ সর্বদা ভালো কথা, কুরআন পাঠ, তাওবা, তাসবীহ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত দ্বীনের কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং আল্লাহর রহমতের আর্দ্রতায় ভিজা থাকবে।

২. অন্তরের রোজা : দ্বিতীয় অঙ্গ

দেহের রোজার ভিত্তি হচ্ছে অন্তরের রোজা। শুধু তাই নয়, যে কোনো ইবাদতে- অন্তরের স্থান সবার আগে।

আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ○

"যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত করেন।"(সূরা আত তাগাবুন-১১)

অন্তরের হেদায়াত সকল ইবাদতের মূল কথা। তাই রোজার জন্য মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রবৃত্তিকে কলুষমুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। সৎ নিয়ত, সৎ চিন্তা, পরিকল্পনা, একনিষ্ঠতা কিংবা এখলাস হচ্ছে অন্তরের মূল কথা। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ ○

'সকল আমলের মূল ভিত্তি হচ্ছে নিয়ত।' (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

"হুশিয়ার শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোশত এমন আছে, যা ঠিক ও সংশোধিত হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে। তা খারাপ হলে গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়, হুঁশিয়ার! সেটি হচ্ছে অন্তর।" (বুখারী ও মুসলিম)

হৃদয় বা অন্তর দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের অন্তর হচ্ছে, ঈমানের রসে সিক্ত ও আল্লাহ প্রেমে উদ্বেলিত। তা দ্বীন ও ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং আল্লাহর প্রতি সকল ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য নিবেদিত। সেই হৃদয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ নিষেধ মানার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। বাতিল ও অনইসলামী কাজের প্রতি তার থাকে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্রোহের মনোভাব। আরেক ধরনের অন্তর হচ্ছে, মৃত ও অসুস্থ্য। তাকে পাপী অন্তরও বলা যায়।

৩. চোখের রোজা : তৃতীয় অঙ্গ

চোখের রোজা আছে। আর তা হচ্ছে হারাম, অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে চোখকে ফিরিয়ে রাখা। এর বিপরীত অবস্থা হলো, ভালো ও নেক কাজের প্রতি চোখ খুলে রাখা এবং তা দেখা। আল্লাহ অনেক কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। সেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার আগে চোখ দেখে ও পরে মন প্রলুব্ধ হয়। এর ফলে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কাজটি করে ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গায়রে মোহাররম স্ত্রীলোকের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করলে শেষ পর্যন্ত তা অবৈধ যৌন আচরণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। অথচ এই দুটো কাজই হারাম।

চোখ হচ্ছে উত্তম শিকারী। তাকে খোলা বা অনিয়ন্ত্রিত রাখলে সে যে কোন সময় পাপের বস্তু শিকার করবে এবং অন্তর ও ঈমানকে নষ্ট করে দেবে। অপরদিকে, চোখ অবনত রাখলে এবং নিষিদ্ধ জিনিসের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলে, মুমিনের অন্তরে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সত্যবাদীদের হৃদয়ে নূর বা আলো সৃষ্টি হয়। এটা চোখ বন্ধ রাখার করণেই আল্লাহ দান করে থাকেন। যারা চোখ খোলা রাখে তাদের ঈমানী অন্তর মরে যায় এবং সে অন্তরে পাপের আগাছা-পরগাছা জন্মে।

রমজান হচ্ছে চোখের প্রশিক্ষণের মাস। এই মাসে চোখকে ঠিক রাখতে পারলে তা মুমিনের পরবর্তী মাসসমূহে দিশারী হিসেবে কাজ করবে। উল্টো দিকে, কেউ পানাহার থেকে বিরত থেকে চোখ খোলা রেখে হারাম জিনিস উপভোগ করলে রোজার মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। তাই চোখের রোজার প্রয়োজনও অনেক বেশি।

৪. কানের রোজা শরীরের ৪র্থ অঙ্গ

কান শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কানের মাধ্যমে বাইরের উদ্দীপক ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আল্লাহ বলেছেন– নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তরকে আল্লাহর কাছে জবাবদীহী করতে হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬)

এই আয়াতে প্রথমে কান ও পরে চোখ এবং অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর দায়-দায়িত্বের বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদীহীর কথাও বলা হয়েছে।

তাই কানের রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। কান যা শুনে সে জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জওয়াব দিতে হবে। কান দিয়ে ভালো জিনিস শুনতে হবে এবং খারাপ জিনিস থেকে কানকে দূরে রাখতে হবে।

কানের রোজা বলতে কী বুঝায়?

কানের রোজা হচ্ছে, বাজে গান-বাজনা না শুনা। মন্দ, খারাপ ও অশ্লীল কথা যেনো কানে প্রবেশ না করে সে জন্য চেষ্টা করা। নেক লোকেরা ভালো কথা ভালোভাবে শুনেন এবং খারাপ কথা কিংবা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকথা তারা শুনে না। কেউ যদি গুনাহ ও পাপের কথা কানে প্রবেশ করায়, তাহলে তা তার **অন্তরের ঘর, সদিচ্ছার প্রাসাদ ও জ্ঞানের বাগানকে ধ্বংস করে দেয়**।

"তারা যখন বেহুদা কথা শোনে, তখন তারা তা এড়িয়ে যায়।" (সূরা - আল-কসাস-৫৫)

অপরদিকে, যারা পাপী ও গুনাহগার; তারা মন্দ ও অশ্লীল কথা, গালি, গান-বাজনাসহ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো শোনে। আল্লাহ প্রদত্ত শ্রবণ শক্তিকে নষ্ট করে দেয়।

৫. পেটের রোজা

পেটের রোজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উপর দেহের রোজার বিশুদ্ধতা নির্ভর করে। মানুষের জীবন, কাজ-কর্ম, চরিত্র ও আচরণের উপর হালাল ও হারাম খাদ্যের প্রভাব পড়ে। তাই হালাল খাবার খেলে ভালো ও নেক কাজ করার প্রেরণা জাগে। পক্ষান্তরে হারাম খাবার খেলে গুনাহ' ও নিষিদ্ধ কাজ করার প্রেরণা জাগে। সে জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ○

"হে রাসূলেরা! তোমরা পবিত্র জিনিস থেকে খাবার গ্রহণ করো এবং নেক কাজ করো।"

এখানে পবিত্র খাবারের সাথে নেক আমলকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র ও হালাল খাবারের অনিবার্য দাবী হচ্ছে নেক কাজ করা। (সূরা আল-মুমিনুন-৫১)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক খাও এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।" (বাকারা-১৭২)

আল্লাহ পবিত্র জিনিসকে হালাল ও অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ ○

"আল্লাহ পবিত্র জিনিসসমূহকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিসসমূহকে হারাম করেছেন।" (সূরা আরাফ-১৫৭)

পেটের রোজা বলতে বুঝায়– পেটকে হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে বাঁচানো। ভূঁড়িভোজ বা অতিরিক্ত আহার না করা, রোজার সময় দিনে পানাহার থেকে বিরত থাকা ও হারাম খাদ্য দ্বারা ইফতার ও আহার না করা।

৬. চিন্তার বিষয়

রোজাদার মুসলমানের চিন্তার বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– "বহু রোজাদার রোজার মাধ্যমে ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই লাভ করে না এবং রাত্রের বহু নামাযী রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই পায় না।" (ইবনে মাজাহ)

চিন্তার বিষয় হলো, রোজার এতো অগণিত পুরস্কার ও মর্যাদা সত্ত্বেও বহু রোজাদার এবং তারাবী ও তাহাজ্জুদ গুজারের ভাগ্যে ক্ষুধা-পিপাসা এবং রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছু জোটে না। রমজান মাসে আল্লাহর সকল মাখলুক আল্লাহর রহমতের স্পর্শ লাভ করে, সেখানে বহু রোজাদারের এই দুরবস্থা কেনো? এর কারণ ও প্রতিকার জানা না থাকলে আমরাও সেই দুর্ভাগাদের মিছিলের অংশীদার হয়ে যেতে পারি। মোটেও বিচিত্র নয় যে, এতদিন আমরা আমাদের রোজার মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসা ও রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারিনি।

তাই রমজানের রোজা সম্পর্কে আজ আমাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা করতে হবে। আসুন, আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে আলোচনা করি। এর ফলে আমরা আমাদের রোজাকে সফল করে তুলতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।

২৭. রমজানের বৈশিষ্ট্য

রমজান মাস মুসলমানের জন্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। এ মাস কল্যাণ ও সৌভাগ্যপূর্ণ। এটি হচ্ছে নেক কাজের মওসুম। এই মওসুমে নেক কাজ করার সুযোগ অনেক বেশি। তাই একজন মুমিন নিজে ঈমান ও আমলকে উন্নত করার জন্য ১১ মাস অপেক্ষা করে। যারা বেশি বেশি নেক কাজ করে এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে, তারা কতই না সৌভাগ্যবান! পক্ষান্তরে, যারা এই মাসকে কাজে লাগাতে পারে না, তারা অবশ্যই হতভাগ্য।

আমরা এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। এর মাধ্যমে যেন আমরা রমজানের মূল শিক্ষা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারি। রমজান যেন আমাদের জীবনে গতানুগতিক না হয়ে কল্যাণ ও মুক্তির প্রতীক হতে পারে, সে চেষ্টা সবাইকে করতে হবে। আল্লাহ আমাদের জীবনে রমজানকে বারবার ফিরিয়ে আনুন, এটাই হোক আমাদের প্রার্থনা।

রমজানের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ–

রমজান তাকওয়ার মাস

১. রমজান মাসের একটি নফল আদায়, অন্য মাসের একটি ফরজ আদায়ের সমান। (বায়হাকী)
২. রমজান মাসে একটি ফরজ আদায়, অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমান। (বায়হাকী)
৩. রমজান সবরের মাস, আর সবরের বিনিময় জান্নাত। (বায়হাকী)
৪. রমজান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। (বায়হাকী)
৫. রমজান মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি পায়। (বায়হাকী)।
৬. রোজাদারকে ইফতার করালে সমান পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে; অথচ রোজাদারের সওয়াব কাটা হবে না। (বায়হাকী)
৭. রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালে হাউজে কাউসারের পানি পান করতে পারবে। জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসা লাগবে না।
৮. জান্নাতে আটটি গেটের মধ্যে একটির নাম রাইয়ান। যে গেট দিয়ে রোজাদার ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)
৯. ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে (নেকী লাভের আশায়) ইবাদত করলে পূর্বের গুনাহ খাতা মাফ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)
১০. রোজাদারের জন্য দুটি খুশির সময়, একটি হলো ইফতার করার সময়, অন্যটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)

১১. রোজা সুপারিশ করে বলবে, হে আল্লাহ, আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির দাবী পূরণে বাঁধা দিয়েছি। তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বাঁধা দিয়েছি। তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে। (বায়হাকী)
১২. রোজাদার ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করতে থাকে।
১৩. রমজানের প্রতি রাত্রে রোজাদারদেরকে মুক্তি দেয়া হয়।
১৪. রমজান মাস বেশি বেশি দান সাদকা করার মাস।
১৫. রমজান মাস কুরআন নাযিলের মাস। তাই রমযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআনে তেলাওয়াত করা একান্ত কর্তব্য।
১৬. রমজান মাস কুরআন বিজয়ের মাস।
১৭. রমজান মাসের ওমরা পালন করা রাসুলুল্লাহ সঃ এর সাথে একটি হজ্জ পালন করার সমান সাওয়াব।
১৮. রোজাদার ব্যক্তি শ্রমিকদের মতই শেষ রমজানে পারিশ্রমিক লাভ করে।
১৯. শেষ রাতের সাহারী (খাবার) বরকতময়।
২০. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ-এর কিয়াম দ্বারা অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
২১. রোজার ত্রুটি মুক্ত করার জন্য ফিতরা আদায় করা হয়।
২২. রমজানে শারীরিক রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়।
২৩. রোজা রাখলে নিন্দা গীবত চর্চা বন্ধ হয়ে যায়।
২৪. রমজানে তওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
২৫. রমজানে ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট অনুভব করার ফলে দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়।
২৬. রমজানের রোজার পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা ঈদের দিনে দিয়ে খুশি করেন।
২৭. সমুদ্রের মাছও রোজাদারের জন্য দোয়া করে।
২৮. রমজানে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হয়।
২৯. রোজাদারের মুখের উপবাস/ক্ষুধা জনিত গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চাইতেও উৎকৃষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)
৩০. রোজাদারের সম্মানে 'বেহেশতে 'রাইয়ান' নামক একটি বিশেষ দরজা খোলা হবে। ঐ দরজা দিয়ে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। (বুখারী, মুসলিম ও ইবনে খোযাইমা)
৩১. আল্লাহ পুরো রমজান মাসে ঈদ পর্যন্ত প্রতিদিন বেহেশতকে সাজাতে থাকেন এবং বলেন সহসাই আমার রোজাদার বান্দারা এখানে প্রবেশ করে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে।
৩২. এই মাসে বড় বড় শয়তানদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় (বুখারী ও মুসলিম)
৩৩. বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)
৩৪. রমজানের প্রতি রাত্রে রোজাদার মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।
৩৫. এই মাসে কদরের রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। এই মাসের প্রথম ১০ দিন দোজখ থেকে মুক্তির দিবস।
৩৬. অন্য মাসে যে কোন নেক কাজের বিনিময় ১০ থেকে ৭শ গুণ। কিন্তু রমজানের রোজার প্রতিদান এর চাইতেও অনেক বেশি। আল্লাহ নিজ হাতে সেই সীমা-সংখ্যাহীন পুরস্কার দান করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)
৩৭. শাওয়ালের মাসের ৬ নফল রোজা রাখলে পূর্ণ বছরের সওয়াব পাওয়া যায়।

২৮. রমযান মাসে কুরআন শিক্ষার ফযিলত

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব - পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার বাণী। যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাযিল করা হয়েছে। কুরআন আসমানি কিতাবসমূহের সর্বশেষ কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো কিতাব নাযিল করা হবে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত আল-কুরআনই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব।

কুরআন নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ :

আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন বিধান আল্লাহর কুরআন নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এর মধ্যে কোনো সন্দেহের লেশমাত্র নেই। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ○

"এটা এমন কিতাব, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।" (সূরা আল-বাকারা : ২)।

আল কুরআন হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। আল-কুরআনের অনুসরণেই কেবল পথহারা জাতি পথের দিশা পেতে পারে। কুরআন হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত। মানুষ ভোজনের আয়োজন করে আর আত্মীয়-স্বজনকে যেমনি দাওয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তেমনি আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার জন্য ভোজনের আয়োজন করেছেন। আর এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ভোজনের আয়োজন।

কুরআন সকল মানুষের পথ নির্দেশ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে?

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

"বস্তুত এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৮)।

এ কুরআন কখনও ভুল বলে না যে তাকে শুধরাতে হবে। কখনও এঁকে-বেঁকে চলে না, যে তাকে সোজা করে দিতে হবে। এর বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই এবং বহুবার পুনরাবৃত্তি করা সত্ত্বেও তা পুরানো হয় না। তোমরা কুরআন পাঠ করো, কেননা আল্লাহ, তোমাদেরকে কুরআন পাঠের জন্য প্রতি অক্ষরে দশটা সওয়াব দেবেন। হাদীসে কুরআন পাঠের মর্যাদা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– হযরত ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– তিন ব্যক্তি কিয়ামতের প্রাক্কালীন মহা আতঙ্কে আতঙ্কিত হবে না। (১) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়লো এবং জনগণের সম্মতি নিয়ে কুরআনের বিধান অনুযায়ী তাদের নেতৃত্ব করলো, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষকে নামাযের দিকে ডাকে এবং (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর হক বান্দার হক সুষ্ঠুভাবে পালন করে। (তাবরানী)

অর্থসহ কুরআন তিলাওয়াত

বরযাত্রীর মর্যাদা হয় বরের কারণে। বর ছাড়া বরযাত্রীর মর্যাদা হয় না। কুরআনের কারণে রমজানের মর্যাদা। কুরআন ছাড়া রোজার মর্যাদা হয় না। রমজান মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, কুরআন নাযিলের কারণে। কুরআন এ মাসে নাযিল হয়েছে বলেই রমজানের এতো মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুগন্ধি ফুলের কারণেই ফুলের পাত্র সুগন্ধি ছড়ায়। এখানে কুরআন হচ্ছে সুগন্ধি ফুল, আর রমজান হচ্ছে পাত্র।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ○

"এই সেই রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য জীবন বিধান, পথ প্রদর্শক, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।" (সূরা বাকারা-১৮৪)

কুরআন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস

আল-কুরআনে "হুজ্জাতুল লাকা আও আলাইকা"- অর্থাৎ কুরআন হয় পক্ষের দলীল, না হয় বিপক্ষের দলীল। কাল কিয়ামতে কুরআন পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দেবে। যারা কুরআন অধ্যয়ন করবে, হালালকে হালাল মেনে চলবে, হারামকে হারাম মেনে চলবে, তাদেরকে জান্নাত দেয়া হবে। আর যারা কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারাম মেনে চলবে এবং যে সকল মুসলমান কুরআনের ৪টি হক্ব:

১. শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করা,
২. কুরআনের অর্থ বুঝা,
৩. কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা,
৪. কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজ গঠন করার জন্য দাওয়াতি কাজ করা। তথা কুরআনের নির্দেশ নিষেধসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

যারা কুরআনের উক্ত ৪টি হক্ব আদায় করে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করবে; হাশরের ময়দানে কুরআন বাদী হয়ে তাদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

এখানে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী-ওসমান রা.)
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং কোন জাতিকে অবনত করেন।" [মুসলিম-ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)]
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "তোমাদের ঘরসমূহকে গোরস্তানে পরিণত করো না, সেখানে কুরআন পড়ো। যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, শয়তান সে ঘর থেকে পালায়। [মুসলিম-আবু হুরায়রা (রা.)]
- প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের সাথে সঠিক আচরণের মাধ্যমেই কেবল রমজানের কল্যাণসমূহ লাভ করা যেতে পারে। কারণ, কুরআনের ওসিলায়ই তো রমজানের এই মর্যাদা। একথা আমাদের সবাইকে ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে হবে যে, রমজান মাস যে মহান গ্রন্থ নাযিলের কারণে মহিমান্বিত হয়েছে, আমাদেরকেও সম্মান, মর্যাদা, কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে হলে সেই আল-কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল-কুরআনের সাথে সঠিক ও যথার্থ আচরণ করতে হলে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে :

১. আল-কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা।
২. একথা বিশ্বাস করা যে, এ কিতাবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
৩. আল-কুরআন তিলাওয়াত করতে শেখা এবং বিশুদ্ধভাবে নিয়মিত তিলাওয়াত করা।
৪. আল-কুরআনকে বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা।
৫. এর উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা।
৬. এর নির্দেশিত হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করা এবং এর নির্দেশিত হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করা।
৭. আল-কুরআনের নির্দেশিত হুকুম-আহকামের আলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করা।
৮. আল-কুরআনকে জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা।
৯. কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা এবং তার অনুসরণ করা।
১০. কুরআনের বিধান কার্যকর না থাকলে; তা কার্যকর করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা।
১১. কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার করা এবং যারা জানে না তাদেরকে কুরআন শিখানোর চেষ্টা করা।

২৯. ইতিকাফ (রোযার শেষ দশকে)

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কোনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরা এবং এর উপর নিজ সত্তা ও আত্মাকে আটকে রাখা। আর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মসজিদে বাস ও অবস্থান করা। সকল সময় ইতিকাফ জায়েয। তবে রমজান মাসে উত্তম। রমজানের শেষ দশকে কদরের রাত পাওয়া এবং এই রাতে ইবাদত-বন্দেগী, তওবা, দোয়া ইত্যাদি করার জন্য তা সর্বোত্তম। নামায, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখা ইতিকাফের দাবী।

শেষ দশক ও ইতিকাফ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো। (সূরা : বাকারা, আয়াত : ১২৫)

ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে কী আচরণ হবে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফকালে স্ত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করো না।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

মদীনায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি বছরই ইতিকাফ পালন করেছেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও রমজানে তিনি ইতিকাফ ছাড়েননি। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) প্রতি রমজানে ১০দিন ইতিকাফ করতেন, তবে যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বছর তিনি ২০দিন ইতিকাফে কাটান। (বুখারি, হাদিস : ১৯০৩)

রমজানের শেষ দশক অর্থাৎ ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে রমজান মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে মুক্তিও লাইলাতুল কদর পাওয়ার সময়। এ সময়ই ইতিকাফ করা হয়। রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে সুন্নত বললেও প্রতি রমজানে ইতিকাফ তিনি কখনও ছাড়েন নি। একবার রমজানে ইতিকাফ করতে না পারার কারণে পরে কাযা আদায় করে ছিলেন। ইতিকাফরত অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে নেয়।

আয়িশা (রা.) আরো বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক রমজানে ইতিকাফ করতেন।" (বুখারি, হাদিস : ২০৪১)

ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো বাইতুল্লাহ শরীফ। বাইতুল্লাহ শরীফের পর মসজিদে নববী। এরপর বাইতুল মাকদিস বা মুকাদ্দাস। তারপর জুমুআ আদায় করা হয়, এমন মসজিদ। এরপর মহল্লার যে মসজিদে নামাজির সংখ্যা বেশি হয়, সে মসজিদে ইতিকাফে সাওয়াব বেশি।

ইতিকাফের উদ্দেশ্য

আল্লামা হাফেজ ইবনে রজব বলেছেন; ইতিকাফের উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। আল্লাহর সাথে পরিচয় যত বেশি হবে, সম্পর্ক ও ভালোবাসা তত গভীর হবে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন : আল্লাহর পথে যাত্রা অব্যাহত রাখা নির্ভর করে যোগ্য ও সঠিক মনের উপর। মন শতধা বিচ্ছিন্ন থাকলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সে জন্যই মনকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করা দরকার। অথচ অতিরিক্ত পানাহার, মানুষের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশা, বেহুদা ও বেশি কথাবার্তা এবং অতিরিক্ত ঘুম মনকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে রাখে। ব্যক্তিকে সকল উপত্যকায় বিচরণ করায়। সে জন্য আল্লাহর পথে যাত্রা বাধা প্রাপ্ত হয়। কিংবা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মেহেরবান আল্লাহ রোজার মাধ্যমে অতিরিক্ত পানাহার ও যৌন কামনাকে রোজার বিধানের মাধ্যমে দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।

ইতিকাফের সওয়াব

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ইতিকাফ করে, আল্লাহ তার ও দোযখের মধ্যে ৩ খন্দক পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক খন্দক পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চাইতে আরো বেশী। (তাবরানী ও হাকেম)।

আলী বিন হুসাইন নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি রমজানের ১০ দিন ইতিকাফ করে, তা দুই হজ্জ ও দুই ওমরার সওয়াবের সমান' (বায়হাকী)।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইতিকাফকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ; ইতিকাফকারী গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাকে সকল নেক কাজের কর্মী বিবেচনা করে বহু সওয়াব দেয়া হবে'। (ইবনে মাজাহ) ইতিকা

ইতিকাফের মর্যাদা

ইতিকাফ সুন্নত। রমজানের শেষ দশ রাত্রে কদরের রাত্রির অন্বেষণে ইতিকাফ করার বিধান, চালু হয়েছে। কিন্তু ইতিকাফের মান্নত করলে তা পালন কর ওয়াজিব হবে। রমজান ছাড়াও কোন সময় মসজিদে অনির্ধারিত সময়ব্যাপী ইতিকাফ করা যায়। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন :

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.

"তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।" (সূরা বাকারা: ১২৫)

وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ.

"তোমরা মাসজিদে ইতিকাফ করার সময় (তোমাদের স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না।" (সূরা বাকারা : ১৮৭)
ইতিকাফ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে ১০ দিন ইতিকাফ করতেন কিন্তু ইন্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেন। (বুখারী)।
হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইতিকাফের মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দু'টি হাদীস আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "কারোর মান্নত যদি আল্লাহর আনুগত্যের জন্য হয়, তা যেনো পূরণ করা হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি জাহেলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ইতিকাফ করার নিয়ত করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মান্নত পূরণ করো।"

ইতিকাফের নিয়ম

১. বেশি বেশি নামায পড়া, অর্থসহ কুরআন ও হাদীস তিলাওয়াত, তাফসীর এবং ইসলামী সাহিত্য পড়া।
২. বেহুদা কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। ঝগড়া-ঝাটি এবং গাল-মন্দ না করা।
৩. মসজিদের একটি অংশে অবস্থান করা। হযরত নাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত– "আবদুল্লাহ বিন ওমর আমাকে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতিকাফের সুনির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়েছেন।" (মুসলিম)

৩০. লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদরের এক রাত্রির মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশি। তাই গুরুত্বপূর্ণ রাত্রিটির মর্যাদা ও গুরুত্ব সকলেরই জানা দরকার। 'লায়লাতুন' অর্থ রাত বা রজনী, আর 'কদর' অর্থ সম্মানিত, মহিমান্বিত। সুতরাং 'লায়লাতুল কদর'-এর অর্থ হলো সম্মানিত রজনী বা মহিমান্বিত রজনী।

লাইলাইতুল কদরের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলামে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র জাহানের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এই রাতেই নাযিল শুরু হয়। কুরআন-হাদীসে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনুল কারীমে 'আল-কাদর' নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা নাযিল করা হয়েছে।

"আমি তা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। তুমি কী জান মহিমান্বিত রজনী কী? মহিমান্বিত রজনী হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; সে রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ [জিবরাঈল (আ.)] অবতীর্ণ হন, তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই, শান্তি সে রজনীতে ঊষার আবির্ভাব (ফজরের সময়) পর্যন্ত।" (সূরা আল-কাদর)

এই সূরার বর্ণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদর-এর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

(১) এ রাতে কুরআন নাযিল করা হয়;
(২) এ রাত হাজার মাস (কারো কারো মতে ৮৩ বছর ৪ মাস) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং
(৩) এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতা দলসহ শান্তির পয়গাম নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। কুরআনুল কারীমের সূরা দুখানেও এ রাতের গুরত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে। "শপথ সুস্পষ্ট কিতাব (আল-কুরআন) এর। আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি মুবারক রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়- আমার আদেশক্রমে।" (সূরা দুখান: ২-৫)

অধিকাংশ মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কুরআন নাযিলের রাতটি সেই সূরা কদর-এ বর্ণিত কদরেরই রাত। এ সূরার বর্ণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদরের রাতের বৈশিষ্ট্য হলো :

(১) এ রাতে কুরআন নাযিল হয়;
(২) এটি বরকতময় রজনী;
(৩) এ রাতে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা নির্ধারণ করা হয়।

হাদীসে এ রাতের বহু ফযীলত ও গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানসহ সওয়াবের নিয়তে ইবাদতের জন্য দাঁড়াবে তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (বুখারী)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কাছে এ মহান মাস (রমজান) এসেছে। এ মাসের মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সমগ্র কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। এর কল্যাণ থেকে একমাত্র হতভাগ্য লোক ছাড়া আর কেউ বঞ্চিত হয় না।" (ইবনে মাজাহ, মিশকাত, আত-তারগীব)

অন্য এক হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, লাইলাতুল কদরে হযরত জিবরাঈল (আ.) একদল ফেরেশতা নিয়ে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। তারা সে সব লোকের জন্য দু'আ করতে থাকেন, যারা এ রাতে দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদতে মশগুল থাকে। (বায়াকী, তাফসীরে ইবনে কাছীর)

প্রকৃতপক্ষে লাইলাতুল কদর উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি মহামূল্যবান নিয়ামত। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুগ্রহ। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের উম্মতগণ দীর্ঘদিন আয়ু পাওয়ার কারণে স্বভাবতই আল্লাহর ইবাদত বেশি বেশি করতে পারতেন। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) স্বল্প আয়ু পাওয়া সত্ত্বেও যাতে ইবাদত বন্দেগির দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সেজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দয়াপরবশ হয়ে তাদের জন্য এমন মহিমান্বিত রজনীর ব্যবস্থা করেছেন।

৩১. যাকাত اَلزَّكٰوةُ বা মাল-সম্পদ পবিত্রকরণ

যাকাত পরিচিতি ও আল কুরআনে যাকাতের ৮২টি আয়াত

اَلزَّكٰوةُ শব্দের আভিধানিক অর্থ اَلنَّمَاءُ বৃদ্ধি; ক্রমবৃদ্ধি, প্রাচুর্য-এর আর একটি অর্থ اَلطَّهَارَةُ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি। ফিকহ'র পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে একটি আর্থিক ইবাদত। ইসলামী পরিভাষায় নিজের ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব মিসকিন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বণ্টন করাকে যাকাত বলা হয়। সালাতের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনা শরীফে যাকাত ফরয হয়। রোজার ন্যায় যাকাত সকল মুসলমানের ওপর ফরয নয়। যাকাত ধনীদের জন্যে ফরয করা হয়েছে। যাদের কাছে বাৎসরিক যাবতীয় খরচের পর ৭.৫০ (সাড়ে সাত) তোলা পরিমাণ স্বর্ণের সমমূল্যের সম্পদ কিংবা ৫২.৫০ তোলা পরিমাণ রৌপ্য বা রৌপ্যের সমমূল্যের সম্পদ গচ্ছিত থাকে, তার ওপরই যাকাত ফরয। গচ্ছিত সম্পদের ২.৫ শতাংশ যাকাত দিতে হয়। নিকটাত্মীয়দের মাঝে যারা গরিব, তাদের যাকাত প্রদান করা উত্তম। তবে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থাকলে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও বণ্টন করা হয়।

মোটকথা দরিদ্র অভাবী জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে যাকাত। যাকাত ইসলামী অর্থনীতির অনন্য রক্ষাকবচ।

আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ আয়াতে যাকাতের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যাকাত اَلزَّكٰوةُ শব্দ দ্বারা ৩০ বার এছাড়া اَلْاِنْفَاقُ শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং اَلصَّدَقَةُ শব্দ দ্বারা ০৯ বার।
মোট ৩০ + ৪৩ + ০৯ = ৮২ বার।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

"আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর আর যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে তোমরাও রুকু কর।" (সূরা আল বাক্বারা ২: ৪৩)

সালাত প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

"আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত আদায় কর এবং যে সব নেকী তোমরা অল্লাহর কাছে অগ্রিম পাঠাবে, তা তাঁর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এর সব কিছু দেখতে পান।" (সূরা আল বাক্বারা : ১১০)

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

"তারা কী এ কথাটা জানে না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তিনি যাকাত ও সদকা গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হচ্ছে তাওবা গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু।" (সূরা আত্ তাওবা: ১০৪)

যাকাত প্রসঙ্গে যা জানা দরকার

যাকাত পাবে যারা

১। ফকীর ২। মিসকীন ৩। যাকাত বিভাগের কর্মচারি ৪। মুআল্লিফাতিল কুলুব (যাদের অন্তর জয় করা প্রয়োজন) ৫। দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য ৬। ঋণ মুক্তির জন্য ৭। আল্লাহর পথে ৮। মুসাফিরদের জন্য। (সূরা আত তওবা: ৬০)

যাকাত পাবে না যারা

১। নিসাবের অধিকারী বা সম্পদশালী, ২। স্বামী ৩। স্ত্রী ৪। উপার্জনক্ষম ৫। পিতা, মাতা এবং ঊধ্বর্গামী যে কেউ ৬। সন্তান এবং নিম্নগামী ৭। বনী হাশিম ৮। অমুসলিম ৯। যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ওয়াজিব।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি

১। মুসলিম হওয়া ২। স্বাধীন হওয়া ৩। বালিগ হওয়া ৪। আকিল হওয়া বা জ্ঞানবান হওয়া ৫। নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা ৬। সম্পদের পূর্ণাঙ্গ মালিক হওয়া ৭। সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা।

যাকাতযোগ্য মালের শর্তাবলি

১। পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ২। আবর্তনশীল হওয়া ৩। নিসাব পরিমাণ হওয়া ৪। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ৫। ঋণমুক্ত হওয়া ৬। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

যে সব মালের যাকাত দিতে হবে

১। নগদ অর্থ ২। পশু সম্পদ ৩। সোনা-রূপা ৪। ব্যবসায় পণ্য ৫। ফল ও ফসল ৬। খনিজ সম্পদ ৭। মধু ৮। গুপ্তধন। ৯। বাড়ি ভাড়া (বাড়ির মূল্য নয়, বাড়ি সংরক্ষণ, সংস্কার ও বিভিন্ন বিলের খরচ বা দেওয়ার পর বাড়ি ভাড়া থেকে আয়।

নোট :- আমাদের সমাজে অনেক মহিলার স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি বা রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা থাকা সত্ত্বেও যাকাত ফরজ হয়েছে মনে করে না। তাই তারা যাকাত দেয় না। সাবধান এ স্বর্ণ-গহনার যাকাত দেয়া ফরজ।

যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই

১। ফল ও ফসল ২। খনিজ সম্পদ (সোনা রূপা ছাড়া) ৩। গুপ্তধন ৪। বাণিজ্যিক খামারের মাছ ৫। মধু। উল্লেখ্য যে, ফল ও ফসলের যাকাতের নাম হলো ওশর।

যেসব সম্পদে যাকাত নেই

১। নিসাবের কম ২। শিল্প কারখার যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী ৩। বসবাসের ঘর ৪। গৃহস্থলীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র ৫। ব্যবহারের যানবাহন ৬। যানবাহন হিসাবে ব্যবহারের ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী, গাড়ী ৭। ব্যবহারের পোষাক পরিচ্ছদ ৮। ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগি ৯। বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু, মহিষ ১০। ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ।

আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তাকিদ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

"যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" (সূরা আল বাক্বারা : ৩)।

وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَ اَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"আল্লাহর পথে খরচ কর এবং আপন হাতেই নিজেরেদকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেও না। ইহসানের পথে চলো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল বাক্বারা ঃ ১৯৫)।

يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ○

"লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কী খরচ করব? জবাব দিন, যে মালই (সম্পদ) তোমরা খরচ কর; নিজের পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইয়াতীম ও মিসকীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ কর।" (সূরা আল বাকারা : ২১৫)

টীকাঃ

যাকাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আরো কতিপয় আয়াত সমূহ ঃ- সূরা বাক্বারাঃ- ৮৩, ১১০, ১৭৭, ২৫৪, ২৬১, ২৬২, ২৬৪ , আত তওবাঃ- ৫, ১১, ১৮, ৩৫, ৫৪, ৩৪, ৬০, ৬৫, ৭১, ৭৫, ৭৯, ৫৮, ৯৯, ১২১, ১০৩, ২৬৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬ নিসাঃ- ৩৮, ৩৯, ৭৭, ১১৪, ১৬২, , রাদঃ ২২ , রোমঃ- ৩৯ , মারইয়ামঃ- ৫৫, ৭১ , হজ্বঃ- ৩৫, ৪১, ৭৮ , কাহাফঃ- ৪২ , মু'মিনঃ ১-৪ , নূরঃ- ৩৭, ৫৬ , বাইয়্যিনাহঃ- ৫ , নামালঃ- ৩ , আনফালঃ- ৩, ৩৬ , হাদীদঃ- ১০ , আস সাজদাঃ- ২, ১৬ , তালাকঃ- ৭ , ইমরানঃ- ৯২, ১১, ১৩৪ , মায়েদাঃ- ১২, ৫৫ , আম্বিয়াঃ ৭৩ , লোকমানঃ- ৪ , আহযাবঃ- ৩৩ , হামীম সাজদাঃ- ৭ , মোজাম্মেলঃ- ২০, ইব্রাহিমঃ- ৩১, তাগাবুনঃ- ১৬, ইয়াসিনঃ- ৪৭, মোহাম্মদঃ- ৩৮, আন নাহলঃ- ৭৫, আশশুরাঃ- ৩৮ ।

অলংকারের যাকাত :

عَنْ زَيْنَبَ رضي الله عنه اِمْرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِّيِّكُنَّ فَاِنَّكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের মাঝে খুতবা দিলেন এবং বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকাহ কর (যাকাত দাও)। যদিও তোমাদের গহনা পত্রের হয়। কেননা কিয়ামতের দিন তোমাদের অধিক অধিবাসী হবে জাহান্নামের।" (তিরমিযী ৩য় খন্ড অঃ যাকাত পৃঃ ১৮)।

যাকাত আদায় না করার করুণ পরিণতি

عَنْاَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ اٰتَاهُ اللهُ مَلًا فَلَمْ يُؤَدِّزَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَاخُذُبِلِهْرِ مَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন-সম্পদ পেয়েছে। কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি। কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সর্পে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দুটি কালো দাগ। এ সর্প সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমরা মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।" (বুখারী ও নাসায়ী)

যাকাত আদায়ের ফযীলত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ مَامِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী ৩য় খন্ড, অ: যাকাত, পৃ: নং ২৭)

মাল পূর্ণ একবছর মালিকানায় থাকতে হবে

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اسْتَفَلَا مَالًا اَلَّا فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয়েছে, যে পর্যন্ত না উক্ত সম্পদ তার কাছে এক বছর থাকে সে পর্যন্ত তাকে তার যাকাত দিতে হবে না।" (তিরমিযী)

৩২. হজ্জ ও উমরা

হজ্জ পরিচিতি

اَلْحَجُّ "হজ্জ" আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অভিপ্রায় বা সংকল্প করা, কোথাও যাবার ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বা ঘর এবং তার সংলগ্ন কয়েকটি স্থানে (মিনা, মোযদালিফা, আরাফার ময়দানে) ইসলামের বিধানানুযায়ী অবস্থান করা বা যিয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়। ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম কাবাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে হজ্জ প্রবর্তন করেন। উম্মতে মুহাম্মদীর উপর নবম হিজরীতে তা ফরয হয়। শরীয়তের বিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যক মুসলমানের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

হজ্জ ফরয হবার শর্ত সাতটি যেমন- ১। সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া ২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ৩। স্বাধীন হওয়া, ৪। সুস্থ হওয়া ৫। যাতায়াত ও মক্কায় অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা ৬। রাস্তা নিরাপদ হওয়া ৭। ফিরে আসা পর্যন্ত স্ত্রী লোকদের জন্যে স্বামী অথবা এমন কোন আত্মীয় সফর সঙ্গী থাকা আবশ্যক যার সাথে বিবাহ হারাম। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ভিতর কেবল হজ্জই শারীরিক এবং আর্থিক উভয় ইবাদতকে শামীল করে। মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে হজ্জ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হজ্জের কুরআনিক নির্দেশ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

"মানুষের ওপর আল্লাহর এ অধিকার যে, বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবার শক্তি সামর্থ্য যে রাখে, সে যেন হজ্জ করে এবং যে এ নির্দেশ অমান্য করে কুফরির আচরণ করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ব প্রকৃতির ওপর অবস্থানকারীদের মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭)

وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿۲۷﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ○

"আর লোকদের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার নিকট সব দূরবর্তী স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে। যাতে তারা তাদের কল্যাণ এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে; তার দেয়া জীবিকা হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করো। অতপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" (সূরা হজ্জ ঃ ২৭-২৮)

হজ্জ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আরো কতিপয় আয়াত

সূরা-বাকারা-১২৫, ১৫৮, ১৯৮, ১৯৯, ১৯৬।

হাদীসে হজ্জের নির্দেশ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "হে লোকেরা, আল্লাহ তোমাদের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন। অতএব তোমরা হজ্জ আদায় করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

হজ্জের গুরুত্ব

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কামনা-বাসনা (স্ত্রী সংগম) ও আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থেকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হজ্জ কার্য সমাধা করে, সে যেন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট (নিষ্পপ) হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করল।" (বুখারী ৩য় খ. অ: হজ্জ, পৃ:-৭০)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, "ওমরার দ্বারা এক ওমরা থেকে অন্য ওমরা পর্যন্ত পাপসমূহ মোছন হয়ে যায়। কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নেই।" (নাসায়ী-৩য় খণ্ড, অধ্যায় হজ্জ পৃ: ২৪২)

হজ্জ তাড়াতাড়ি করা উচিত

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَوْ اَحَدِهِمَا عَنِ الْاٰخِرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ .

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "হজ্জের ইচ্ছা পোষণকারী যেন তাড়াতাড়ি তা সম্পূর্ণ করে ফেলে। কেননা সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার উট হারিয়ে যেতে পারে বা তার ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।" (ইবনে মাজাহ)।

হজ্জের জন্য যা আবশ্যক

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ فَقَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু হজ্জকে ফরয করে? রাসূল (সা.) বললেন, নিজের এবং পোষ্যদের যাবতীয় খাওয়া-পরার খরচ এবং সফর খরচ। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ পোষ্যদের যাবতীয় খরচ ও মক্কা শরীফ পর্যন্ত যাতায়াত খরচ বহন করতে সক্ষম, তার জন্যই হজ্জ ফরয।)" (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হজ্জ ৩ প্রকার, যথাঃ (১) তামাত্তু, (২) কিরান ও (৩) ইফরাদ

প্রথমতঃ তামাত্তু হল হজ্জের সফরে মিকাতের বাইরে থেকে প্রথমে উমরা করার জন্য নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে মক্কা গিয়ে প্রথমে ওমরাহ করে হালাল হয়ে ইহরামের কাপড় বদলিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা। এরপর ৮ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পর হজ্জ পালনের নিয়তে মক্কা থেকে আবার ইহরাম বেঁধে মিনা গমন করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ কিরান হল মিকাতের বাইরে থেকে উমরা ও হজ্জ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা গিয়ে উমরা পালনের পর ইহরাম অবস্থায় থেকে হজ্জ সম্পাদন করা।

তৃতীয়তঃ ইফরাদ হল মিকাতের বাইরে থেকে শুধুমাত্র হজ্জ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পন্ন করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থেকে উমরা করা ছাড়াই শুধু হজ্জ করা।

যারা তামাত্তু হজ্জ পালন করবেন তাদেরকে উট বা গরুতে দমে শোকর হিসাবে এক ভাগ এবং কুরবানী হিসাবে একভাগ অর্থাৎ দুইটি ভাগ দিবেন। দুম্বা/ভেড়া/বকরিতে হলে দুইটি পশু কুরবানি দিতে হবে।

আর কিরান হজ্জ পালনকারীকে উট বা গরুতে ১ ভাগ বা দুম্বা/ভেড়া/বকরি হলে একটি পশু কুরবানি দিতে হবে।

আর ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর জন্য কুরবানী করার বিষয়টি ঐচ্ছিক।

তবে যদি কেউ হজ্জের কোন ওয়াজিব তরক করেন তাকে দম বা কাফফারা হিসাবে একটি পশু বা উট/গরুতে একভাগ কুরবানি দিতে হবে।

যাদের কুরবানি দেওয়ার সামর্থ নেই, তাদেরকে ১০টি রোজা পালন করকে হবে। তন্মধ্যে মক্কার হেরেমের সীমার মধ্যে থাকা অবস্থায় ৩টি এবং দেশে ফিরে ৭টি রোজা পালন করতে হবে।

মিকাতঃ

কা'বা শরীফ গমনকারীদেরকে কা'বা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বে থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়, যে স্থানগুলো নবীজির হাদীস দ্বারা নির্ধারিত আছে। ঐ জায়গাগুলোকে মীকাত বলা হয়। হারাম শরীফের চর্তুদিকেই মীকাত রয়েছে। মীকাতসমূহ তিন ধরনের। যথা (ক) বহিরাগতদের মীকাত, (খ) অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের মীকাত, (গ) মক্কাবাসীদের মীকাত।

(ক) বহিরাগত লোকদের জন্য মীকাত ৫টি যথা–

১. মদীনাবাসীদের জন্য যুল হুলাইফা ذوالحليفة

২. সিরিয়াবাসীদের জন্য আল-জুহফা الجحفة।

৩. নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল قرنالمنازل

৪. ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম يلملم

৫. ইরাকবাসীদের জন্য যাতুইরক ذاتعرق

(খ) অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের মীকাত : মক্কা নগরীর বাইরে এবং মীকাতসমূহের ভিতরে অবস্থানকারী হাজীদের মীকাত হলো তথা হারামের বহিরাঙ্গণ।

(গ) মক্কাবাসীদের মীকাত : মক্কাবাসীদের হজ্জের মীকাত হলো তানয়ীম বা আয়শা মসজিদ, যা হারাম শরীফ থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। আর ওমরার মীকাত হলো : হজ্জ ও ওমরা পালনকারীর জন্য ইহরাম বাঁধা ফরয। তবে নির্ধারিত মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হবে।

ইহরাম বাঁধার নিয়মঃ

নির্ধারিত মিকাত থেকে (সম্ভব হলে) গোসল করে অথবা অজু করে পুরুষরা সেলাই বিহীন ২টি কাপড় পরবেন। আর নারীরা পর্দাসহশালীন পোশাক পরবেন। এরপর যে যেই ধরণের হজ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কা যাচ্ছেন সে সেই ধরনের হজ্বের নিয়ত করবেন এবং তখন থেকে যত বেশি সম্ভব তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। যেমন তামাত্তু হজ্জ পালনকারীরা মিকাত থেকে শুধু ওমরার নিয়ত করবেন। কিরাহ হজ্জ পালনকারীরা ওমরা ও হজ্জের নিয়ত একসাথে করবেন এবং ইফরাদ হজ্জ পালনকারীরা শুধু হজ্জের নিয়ত করবেন। হজ্জ ফ্লাইটগুলিতে সাধারণত: মিকাত সন্নিকটবর্তী হলে ইহরাম বাঁধার ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করা ও কবুল হজ্জ করার তৌফিক লাভ করার জন্য মনে-মনে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকা উত্তম।

বিশ্বের সব দেশ হতে আগত মুসলিমদেরকে মিকাত সীমানা অতিক্রমের পূর্বে প্রত্যেকের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ইহরামের কাপড় পরিধান করতে হবে। যদি কেউ তার বসবাসকারী দেশ থেকে সরাসরি ফ্লাইটে হজ্জ বা ওমরা করার জন্য সৌদি আরব যান; তারা তাদের দেশের এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের পর ফ্লইটে উঠার আগে ওয়েটিং স্থলে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। আর যদি ফ্লাইটে ইহরামের কাপড় পড়ার সুবিধা থাকে; তাহলে সেখানে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। আর যারা তাদের বসবাসকারী দেশ থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে সৌদি আরব না গিয়ে অন্য কোন দেশের এয়ারপোর্টে ট্রানজিট করে সৌদি আরব যাবেন; তারা ট্রানজিটের সময়ের উপর নির্ভর করে নিজ দেশ থেকে বা ট্রানজিটকৃত এয়ারপোর্টে

ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। ফ্লাইটে মিকাত আসন্ন হওয়ার ঘোষণা করা হয়। ফ্লাইট যখন মিকাত অতিক্রম করছে বলে ঘোষণা করা হয়। তখন হজ্জ বা ওমরা পালনকারীগণ যে যেই হজ্জ করবেন সেই হজ্জের নিয়ত করবেন। তামাত্তু হজ্জ পালন কারীগণ যেহেতু প্রথমে ওমরা করে হালাল হয়ে যাবেন তারা প্রথমে মিকাত থেকে ওমরার নিয়ত করবেন। আর **কিরান** ও **ইফরাদ** হজ্জ পালনকারীগণ মিকাত থেকে সরাসরি কিরান বা ইফরাদ হজ্জের নিয়ত করবেন।

উল্লেখ্য যে, যদি ফ্লাইটের মধ্যে মিকাত নিকটবর্তী হওয়ার সময় যদি কারো ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তিনি তার সফর সংগীদেরকে বলে রাখবেন- যাতে ফ্লাইটে মিকাত কিনটবর্তী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া মাত্র যেন তাকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ওমরা বা হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গমনকারী কেউ যদি মিকাত থেকে ইহরাম তথা নিয়ত ব্যতিরেকে সৌদি আরব পৌঁছে যান, তা হলে তাকে পুনরায় সৌদি আরবের স্থলভাগে অবস্থিত নিকটবর্তী মিকাতে গিয়ে ইহরাম বেঁধে ওমরা বা হজ্জ পালন করতে হবে। ইহরাম ব্যতীত মিকাত অতিক্রম করার কারণে তাকে একটি দম দিতে হবে।

ওমরা বা হজ্জ ব্যতীত অন্য সকল ইবাদতের নিয়ত করার সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতি হল মনে-মনে সংশ্লিষ্ট ইবাদতের নিয়ত করা। মুখে নিয়তের শব্দ উচ্চারণ করা উত্তম। তবে রাসূলুল্লাহ স: ও সাহাবীগণ ওমরা এবং হজ্জের জন্য অন্তরে-অন্তরে নিয়ত করার পর মুখেও নিয়তের শব্দ উচ্চারন করতেন।

হজ্জ /ওমরার নিয়তঃ হজ্জ/ওমরা ছাড়া অন্যান্য নেক আমলের নিয়ত মনে-মনে করতে হয়। কিন্তু হজ্জ-ওমরা এ দুটি ইবাদাতের যে কোনোটির জন্যই নিয়ত মৌখিক উচ্চারণে করা শরিয়ত সম্মত। নীচে ওমরা হজ্জের হজ্জের নিয়ত উল্লেখ করা হলো:

ওমরা বা তামাত্তু হজ্জ পালনকারীগণের নিয়তঃ

ওমরার সংক্ষিপ্ত নিয়ত

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান)।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

তামাত্তু হজ্জ পালনকারীগণ মক্কায় পৌছে ওমরা পালন করার পর হালাল হয়ে স্বাভাবিক ভাবে মক্কা অবস্থান করবেন। ফরয নামাজ ও তাওয়াফ সহ অন্যান্য নফল ইবাদত করবেন। ৭ই জিলহজ্জ ইশার পর অথবা ৮ই জিলহজ্জ ফযরের পর ঘর / হোটেল থেকে ইহরামের কাপড় পরিধান করে মনে-মনে হজ্জের নিয়ত করে মুখে বলবেন-

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মাহাজ্জান)

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

আর যারা কিরান বা ইফরাদ হাজ্জ পালনকারীদের নিয়তঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মাহাজ্জানওয়াওমরাতান।)

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি ওমরা ও হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির।"

তালবিয়াঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ – لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ – اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ – لاَ شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মুল্ক, লা শারিকা লাক।

অর্থ: "আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আমি হাজির; তোমার কোনো অংশীদার নেই; আমি উপস্থিত, নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা; অনুগ্রহ ও সম্রাজ্য সবই তোমার, তোমার কোনো অংশীদার নেই।"

যারা মক্কা পৌঁছে প্রথমে ওমরা করবেন, তারা তাাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ না পড়ে সরাসরি কা'বার নিকট গিয়ে হজরে আসওয়াদ বরাবর ডান পার্শ্বের দেওয়ালে সবুজ বাতি বরাবর পৌঁছে কা'বাঘর ও হজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে নিয়ত বাঁধার মতো করে এক হাত উত্তোলন করে "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার" বলে তাওয়াফ শুরু করবেন। তাওয়াফের মধ্যে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দোয়া সহ নিজ ভাষায় দোয়া করতে করতে **রোকনে ইয়ামেনী** বরাবর আসার পর। সেখান থেকে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত প্রতি চক্করে যে দোয়াটি পড়তে হবে তা হল–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: "রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আজাবান-নার।"

অর্থ : "হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন। আর পরকালেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে (জাহান্নামের) আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা বাকারা : আয়াত ২০১)

আরবীতে দোয়া মুখস্ত না থাকলে বাংলা ভাষায় আপনার মনের সব কথা বিনয় ও নরম স্বরে দোয়া কবুলের সুদৃঢ় আশা নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। উল্লেখ্য যে, দোয়া কবুলের প্রধান শর্ত হল ইখলাসের সাথে ও হালাল রিজিক গ্রহণ করে দোয়া করা। বিরতি না দিয়ে সাত চক্কর শেষ করা এবং অজুর সাথে তাওয়াফ করা শর্ত। তবে তাওয়াফ রত অবস্থায় নামাযের জামাতের সময় হয়ে গেলে, যেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবেন সেখান থেকে আবার তাওয়াফ শুরু করে সাত চক্কর পুরা করবেন। কোন ওজরের কারণে অজু ভঙ্গ হলে যেখানে অজু ভঙ্গ হবে সেখানে থেমে গিয় অজু করে এসে বাকী তাওয়াফ শেষ করে মাসজিদুল হারামের মাকামে ইব্রাহীমের নিকটে বা যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করে যমযমের পানি পান করার পর দোয়া শেষে সাফা-মারওয়ায় সাত বার সায়ী করার জন্য যাবেন।

প্রথমে সাফা পাহাড়ে এসে কা'বা ঘর দেখা যায়। এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে "বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার" বলে সায়ী শুরু করবেন। সাফা পাহাড় থেকে সায়ী শুরু করে প্রথমেই

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

উচ্চারণ: "ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিং শাআয়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আয়িতামারা ফালা ঝুনাহা আলাইহি আঁইয়্যাত ত্বাওয়াফা বিহিমা ওয়া মাং তাত্বাওওয়াআ খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকেরুন আলিম।" (সুরা বাকারা : আয়াত-১৫৮)

অর্থ: "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালো কাজের কল্যাণদাতা ও সর্বজ্ঞ।"
সাফা থেকে মারওয়া এক চক্কর। এই হিসাব করে সাত চক্কর শেষ করবেন। মাঝখানে সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থানটি পুরুষরা দৌড়ে পার হবেন। মহিলারা স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবেন।

বদলী হজ্জ :

عَنْ اَبِيْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِي اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبِيْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعَنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ

আবু রাজীন উকাইলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ এবং ওমরা করতে পারছেন না। তিনি এত বৃদ্ধ যে বাহনে বসতে পারেন না। (এমতাবস্থায় কী করার আছে?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও ওমরা আদায় কর।" (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী)

হজ্জের আহকাম

হজ্জের ফরয তিনটি :

১. ইহরাম বাধা বা আনুষ্ঠানিকভাবে হজ্জের নিয়ত করা।
২. আরাফাতে অবস্থান (উকূফ) ৯ যিলহজ্জের সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো মুহূর্তের জন্যে হলেও।
৩. তাওয়াফে যিয়ারত, ১০ যিলহজ্জের ভোর থেকে ১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোনো দিন কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা। এ তিনটি ফরযের একটি যদি ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে। পরবর্তী বছরে তার কাযা আদায় করতে হবে।

ওমরার ফরয দুইটি: (১) নিয়ত করে ইহরাম বাঁধা (২) কা'বা ঘর তাওয়াফ করা।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ :

১. মীকাতের আগেই ইহরাম বাধা।
২. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে উকূফ বা অবস্থান করা।
৩. সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা এবং সাফা থেকে সা'ঈ আরম্ভ করা।
৪. মুযদালিফায় উকূফ বা অবস্থান করা।
৫. তাওয়াফে যিয়ারত আইয়্যামে নহরের বা কুরবানীর দিনের মধ্যে সম্পাদন করা।
৬. মিনায় রমী বা শয়তানকে কংকর মারা।
৭. ১০ই যিলজ্জ বড় যামরাতে (আমাদের দেশে বড় শয়তান বলে) ৭টি পাথর মেরে, কোরবানী করে মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইজাফা (কা'বা ঘর ৭ বার তওয়াফ করা) শেষ করে মাথা মুণ্ডন করা।
৮. মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ করা। এগুলোর কোনো একটিও ছুটে গেলে হজ্জ হয়ে যাবে, তবে দম দিতে হবে। অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হবে। এছাড়া হজ্জের অন্যান্য কার্যাদি সুন্নাত, মুস্তাহাব বা হজ্জের আদব পর্যায়ের।

হজ্জের সুন্নাতসমূহ :

১। মীকাতের বাইরের লোকদের মধ্যে যারা ইফরাদ বা কিরান হজ্জ করেন, তাদের জন্যে তাওয়াফে কুদুম করা।

২। তাওয়াফে কুদুমে (হজ্জের নিয়তে মক্কায় গিয়ে প্রথম যে তওয়াফ করা হয়) রমল করা (তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে মুজাহিদের মতো বীরদর্পে দুই কাঁধ ও শরীর দুলিয়ে দ্রুত হাঁটা বা সম্ভব হলে আস্তে-আস্তে দৌড়ানোর চেষ্টা করা)। এ তাওয়াফে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা বিদায়ী তাওয়াফে তা করে নিতে হবে।

৩। ইমামের জন্যে তিন স্থানে খুতবা প্রদান করা। অর্থাৎ ৭ যিলহজ্জ মক্কা মুকাররমায়, ৮ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে এবং ৯ যিলহজ্জ মিনায়।

৪। ৮ যিলহজ্জ দিবাগত রাতে মিনায় অবস্থান।

৫। ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া।

৬। আরাফাতের ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবে নামায আদায় না করে মোযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৭। আরাফাত থেকে ফেরার পথে মুযদলিফায় এসে এক আজানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায জামায়াতে আদায় করে সেখানে রাতি যাপন করা।

৮। আরাফাতে গোসল করা।

৯। ১০ই যিলহজ্জ তারিখে মক্কা থেকে ফিরে এসে ১১ ও ১২ যিলহজ্জ ৩টি জামরাতে পাথর মারা শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১০। মোযদালিফা থেকে মিনা ফেরার পথে মুহাসসার নামক স্থানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা।

একনজরে হজ্জের ৬ দিনের কার্যক্রম

হজ্জের ১ম দিন, ৮ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: ইহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মীনায় রওয়ানা।

দ্বিতীয়: মীনায় জোহর নামায পড়ুন।

তৃতীয়ত: আসর পড়ুন।

চতুর্থত: মাগরিব পড়ুন।

পঞ্চমত: ইশা পড়ুন।

ষষ্ঠত: মীনায় অবস্থান করুন।

হজ্জের ২য় দিন, ৯ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: ফজরের নামাজ মীনায় পড়ে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হউন এবং তাকবীরে তাশরীফ পড়া শুরু করুন।

দ্বিতীয়: জোহর ও আসর নামাজ একত্রে আরাফাতে আদায় করুন।

তৃতীয়ত: আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকুন।

চতুর্থত: সূর্যাস্তের পর মাগরিব না পড়ে মুযদালিফায় রওয়ানা হউন।

পঞ্চমত: মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামাজ এক আজান ও দুই ইকামতে আদায় করুন।

ষষ্ঠত: মুযদালিফা থেকে রাত্রে ছোট ছোট ৭০টি পাথর সংগ্রহ করুন করুন, নফর ইবাদত বন্দেগী করুন এবং বিশ্রাম করুন।

হজ্জের ৩য় দিন, ১০ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: মুযদালিফায় ফজরের নামাজের পর সূর্য উদয়ের পূবে বড় শয়তানকে পাথর মারার জন্য মীনায় রওয়ানা হউন।

দ্বিতীয়: সূর্য হেলার পূর্বেই মীনায় বড় শয়তানকে ৭টি পাথর মারুন।

তৃতীয়ত: নিজ দায়িত্বে কুরবানী করুন।

চতুর্থত: পুরুষগণ মাথা মুণ্ডিয়ে এবং মহিলারা চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ইহরাম মুক্ত হউন।

পঞ্চমত: মক্কায় গিয়ে ফরয তাওয়াফ করুন এবং ৭/৮ জিলহজ্জ অগ্রিম সায়ী না করে থাকলে এখন সায়ী করুন।

ষষ্ঠত: তাওয়াফ ও সায়ী শেষে মীনায় ফিরে এসে রাত্রি যাপন করুন।

হজ্জের ৪র্থ দিন, ১১ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: ফরয তাওয়াফ, সায়ী, কুরবানী ও মাথা না মুন্ডিয়ে থাকলে আজ শেষ করুন।

দ্বিতীয়: সূর্য হেলার পর এবং সূর্য ডোবার আগে ৩টি জামরাতে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করুন।

তৃতীয়ত: প্রথম ছোট জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং দোয়া করুন।

চতুর্থত: মেঝো জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং দোয়া করুন।

পঞ্চমত: বড় জামারাতে ৭টি মাথর মারুন এবং তাড়াতাড়ি তাবুতে প্রত্যাবর্তন করুন।

ষষ্ঠত: মীনায় রাত্রি যাপন করুন।

হজ্জের ৫ম দিন, ১২ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: ফরয তাওয়াফ, সায়ী, কুরবানী ও মাথা না মুন্ডিয়ে থাকলে আজ শেষ করুন।

দ্বিতীয়: সূর্য হেলার পর এবং সূর্য ডোবার আগে ৩টি জামরাতে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করুন।

তৃতীয়ত: প্রথম ছোট জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং দোয়া করুন।

চতুর্থত: মেঝো জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং দোয়া করুন।

পঞ্চমত: বড় জামারাতে ৭টি মাথর মারুন এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই মীনা ত্যাগ করুন।

ষষ্ঠত: সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ করতে না পারলে মীনার তাবুতে রাত্রি যাপন করুন।

হজ্জের ষষ্ঠ দিন, ১৩ই জিলহজ্জ-

প্রথমত: ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা ত্যাগ না করলে ১৩ জিলহজ্জ মীনায় অবস্থান করে ৩টি জামারাতে ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কা শরীফে চলে যান।

দ্বিতীয়: আসরের নামাজ পড়ে তাকবীরে তাশরীফ পড়ুন। এরপর আর তাকবীরে তাশরীক পড়তে হবে না।

হজ্জের পর বাড়িতে ফিরে আসার পর করণীয়ঃ

কুরআন-সুন্নাহের বিধান মতে যাদের মাবরুর হজ্জ নসীব হবে, তাদের পরের হক্ব ছাড়া আল্লাহর হক্ব তরক করার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যাবেন। তাই হাজী সাহেবানদের উচিত পরের হক্ব আদায় করা এবং কারো হ্ক্ব নষ্ট না করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্তকর্তা অবলম্বন করা। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, দান-সদকা, পরোপকার, সমাজ সেবা ইত্যাদি কাজেল লিপ্ত থাকা। তওবা, দরূদ পাঠ, যিকির, কুরআন-হাদিস বুঝে পড়ার চেষ্টা করা, আমল, আখলাক, ইখলাস, খুশু-খুজু, তাওয়াক্কুল, সবর, তাকওয়া ইত্যাদি উন্নত করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকা। সব ধরনের হারাম যেমন সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, গীবত, চোগলখুরী, তোহমত ইত্যাদি সব পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহর নিকট তৌফিক কামনা করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা। ওলামায়েকেরামগণ বলে থাকেন হজ্জ কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ হলো হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর ঈমান, আমল, আখলাক ইত্যাদি উন্নত হওয়া। আর হজ্জ কবুল না হওয়ার একটি লক্ষণ হলো হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর ঈমান, আমল, আখলাক ইত্যাদির অবনতি হওয়া।

৩৩. দাওয়াহ্ বা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা

দাওয়াত অর্থ কী? কেনো আমরা দাওয়াতী কাজ করব? কাকে ও কিসের এবং কোন্ পদ্ধতিতে দাওয়াত দিবো?

দাওয়াত অর্থ মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যে নির্দেশ নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে নির্দেশ বা সংবাদ মনে প্রাণে সত্য স্বীকার করে কাজে পরিণত ও আনুগত্য করার দিকে ডাকা। আহ্বান করা। আমন্ত্রণ করাকে দাওয়াতী কাজ বলে। এটা নবীওয়ালা কাজ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মিশন। আখেরি নবীর উম্মতের উপর দাওয়াতী কাজ করা ফরযে কিফায়া। এই সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা হলো–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে আর এরাই সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান: ৩/১০৪)

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ اَيَةٌ.

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানা থাকলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।" (বুখারী: ৩৪৬১)

অর্থাৎ যে কাজে মানুষের কল্যাণ, হেদায়েত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, উত্তম ও সৎ আমল এর সত্যিকার হক আদায় করে মানুষের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করা। সেখানে থাকবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে পূর্ণাঙ্গ আকিদা ও শরীয়তের বিধি-বিধানে উন্নতি করে বাতিল আকিদা, জাহেলী নিয়ম-কানুন ও নিকৃষ্ট বিধানসমূহ দূরীভূত করা। এটাই দাওয়াতী কাজ নামে অভিহিত।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইহকালীন কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তির জন্যে মানব জাতিকে ইসলামের জীবন বিধানের দিকে আহ্বান করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কওম বা জাতি যখন আল্লাহর বিধানকে ভুলে গিয়ে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে যুগের উপযোগী মানব জাতির মধ্য হতে সঠিক পথ দেখানের জন্য নবী ও রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ইবাদত করার জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন আল্লাহর প্রদত্ত কিতাব- ইহা মানবজাতির জীবনবিধান। রাসূল (সা:) আমাদের পথপ্রদর্শক। আমরা নিজেকে একজন ভালো মুসলমান দাবী করলে দাওয়াতী কাজের বিকল্প নাই।

যাঁরা দৈনিক কিছু সময় দাওয়াতী কাজ করার নিয়ত রাখে, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তারা হলঃ

১। মজবুত ঈমানে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সকল হারাম কাজ বর্জন করে চলে।
২। কুরআন হাদীসের আলোকে আমল করে।
৩। মানুষের উপকারে কাজ করে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে।
৪। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ ও শয়তানের নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে।
৫। সত্যকে ঊর্ধে রেখে মিথ্যাকে দুর্বল করে প্রচার করে।
৬। কুফরী দূরীকরণ ও তৌহিদের আহবানে কাজ করে।
৭। নম্র, বিনয়, কোমল, প্রজ্ঞা খাটিয়ে অল্প কথায় তাঁদের বক্তব্য উপস্থানা করে।
৮। শ্রোতাদের মন-মেজাজ বুঝে তাড়াহুড়া না করে, তাঁদের মতামতের প্রাধান্য দিয়ে শ্রদ্ধাসুলভ আচরণের সাথে কথা বলে।
৯। সমাপ্ত কালে নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে সূরা আসর পড়ে বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করে।

দাওয়াতী কাজ ফরজ মনে করে যাঁরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে, জান্নাতের অীধবাসী হতে চান তাঁরা দুনিযাতে জীবিত থাকা অবস্থায় ক্ষণস্থায়ী জীবনে দৈনিক ১০ মিনিটের জন্য হলেও মুসলিম ও অমুসলিমের দাওয়াত দেওয়ার নিয়ত করুন। এর সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান দিবেন।

আপনার দাওয়াতী কাজের নিয়ত ও পরিকল্পনার সংকল্প বা বাস্তবায়ন দেখে আপনার পরিবারভুক্ত লোকজন দাওয়াতী কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দাওয়াত কাজ আরম্ভ করতে পারে।

দাওয়াতী কাজ করণীয় ব্যক্তিগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দাওয়াতী কাজ করার জন্য কবুল করুন! আমীন।

দাওয়াতী কাজ কত প্রকার, কোন পদ্ধতিতে দাওয়াতী কাজ করা যায়-

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দাওয়াতের গুরুত্ব ও কিছু পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ–

সাধারণ অর্থে দাওয়াত (দুই) প্রকার-
(১) ইসলামের দাওয়াত (যারা আল্লাহ ও রাসূল/আখিরাত ও ইসলামের কথা বলে)
(২) তাগুত ও আল্লাহ বিরোধী শয়তানের দাওয়াত-

ইসলামের মূল বক্তব্য- "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"

মুসলিম উম্মাহর দাওয়াতের ঘোষণা ৪টি।

(১) একজন মুসলিম হিসেবে কলেমা ও সত্যকে ঘোষণা দিতে হবে।

(২) এ দাওয়াতই মুসলিম উম্মাহর জাতীয় দায়িত্ব।

(৩) এ দাওয়াতই ইসলামের জীবন শক্তি।

(৪) এ দাওয়াতই হবে পথহারা, দিশেহারা, পথভুলে যাওয়া, বিভ্রান্ত ও মজলুম মানবতার পথের ঠিকানা যা তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

(১) দাওয়াতী কাজ সর্বোত্তম কাজ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভালো কথা আর কার হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেকআমল করে এবং বলে আমি মুসলমান।" (হা-মীম সিজদা - ৩৩)

(২) আল্লাহর পথে আহ্বান করার পদ্ধতি

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

"হে নবী! তোমার রবেরপথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়। তোমার রবই অধিক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, আর কে সঠিক পথে রয়েছে।" (সূরা নাহল :১২৫)

(৩)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

"তাদেরকে পরিস্কার বলে দাও: আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

(৪)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।" (সূরা আহযাব: ৪৫-৪৬)

(৫)

নবী-রাসূলগণের কাজ

প্রত্যেক নবী-রাসূলগণই আপন আপন জাতিকে দ্বীনের পথে আনার জন্য দাওয়াতী কাজ করেছেন। আল্লাহু পাক বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ○

"হে রাসূল আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এ (দাওয়াতী) কাজ না করেন, তবে তো আপনি তাঁর পয়গামের কিছুই পৌঁছালেন না।" (সূরা মায়েদা : ৬৭)

(৬)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ○

"তোমরাই তো হলে সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যই পয়দা করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" (সূরা আল ইমরান: ১১০)

উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন,

(৭)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

"আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল লোক থাকা উচিত; যারা মানুষকে ডাকবে সৎ কাজের দিকে, ভালো এবং উত্তম কাজের প্রতি নির্দেশ দেবে, আর বাঁধা দেবে অন্যায় এবং পাপ কাজ থেকে। আর এরাই তো হলো সফলকাম।" (সূরা আল ইমরান: ১০৪)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ্ বলেন -

(৮)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

"আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি"। (সূরা জারিয়াত-৫৬) সুতরাং আল্লাহর বন্দেগী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো দাওয়াতী কাজ করা।

(৯)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

"যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান। অন্যদিকে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষক হলো তাগুত, যে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যান। এরাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।" (সূরা বাকারা-২৫৭)

কালেমার দাওয়াতই ছিল সকল যুগের সকল নবী রাসূলের কাজ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা, পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৫১ নং আয়াতে বলেন–

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا ○

"তোমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি যে তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করে, পরিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিবে যা তোমরা জানতে না।"

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً بَلِّغْتَس شَيْدِ اِلَى الْغَائِبِ ○

"আমার একটি বাক্য যদি পাও অপরের কাছে পৌঁছে দাও।" উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দাও।

দাওয়াতের ব্যাপারে কুরআনের আরো কিছু আয়াত টীকা দেখুন:
(সূরা আরাফ: ৫৯, ৬৫, ৮৫) (আশ শূরা: ১৫) (ফাতির: ২৪) (ইব্রাহীম: ৫) (বনি ইসরাইল: ৫৩-৫৪)। (মুদাসসির: ১-৩)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ জাতীয় দায়িত্ব (হাদীস)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُنْ مُنْكَرًا عَلٰى فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ.

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিকভাবে নিষেধ করে। যদি সে মৌখিকভাবে বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরে উক্ত কাজকে প্রতিরোধের চিন্তা করে। আর অন্তরে প্রতিরোধের চিন্তা করাটা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ।" (সহীহ মুসলিম)।

عَنْ جَرِيْرٌ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضي الله عنه قَالَ سَمِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِيْ قَوْمٍ يَّعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَفَلَا يُغَيِّرُوْا اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْكُمْ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا .

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর নবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না। আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেবেন।" (আবু দাউদ)

দাওয়াতী কাজের গুরুত্বপূর্ণ কথা একাধিক বার বলতে হবে–

عَنْ اَنَسٍ رضي الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ .

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী করীম (সা.) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেন তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে।" (সহীহ বুখারী)

দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে আমলও করতে হবে-

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মিরাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি জিব্রাইল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো আপনার উম্মতের মুবাল্লিগ (প্রচারক)। যারা অপরকে নেক কাজ করার নসিহত করত, কিন্তু নিজেরা তা আমল করত না।" (মিশকাত)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ .

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার কর। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর। তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে তার নিজ চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত।" (তিরমিযী- ৫ম খণ্ড,অ: ইলম, পৃ: নং- ১২২)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُوْنَهٗ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বারণ করবে। নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে) দোয়া করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল হবে না।" (জামে তিরমিযী)

৩৪. অমুসলিম দেশে দাওয়াত দানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

দাওয়াতের প্রকারভেদ - দাওয়াত সাধারণত দুই প্রকার।

১। আল্লাহর দিকে তথা ইসলামের দিকে দাওয়াত।

২। জাহেলিয়াতের দিকে দাওয়াত

দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব

- নবীদের কাজ
- শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষার মাধ্যম
- আল্লাহর প্রিয়তম হওয়ার মাধ্যম
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপায়।

কীসের দাওয়াত

- দাওয়াত হবে আল্লাহর দিকে দ্বীন তথা ইসলামের দিকে, কুরআনের দিকে।
- সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের দিকে।

- মৌলিক ইবাদতের দিকে
- ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ এর দিকে
- সঠিক লোকের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলা।
- দাওয়াত হবে কালেমার, যার মধ্যে রয়েছে একমাত্র ইলাহ আল্লাহ্ এবং আদর্শ নেতা মুহাম্মদ (সা.)।

দাওয়াতী কাজের মাধ্যম

- ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে
- টেবিল টকের মাধ্যমে
- বক্তব্যের মাধ্যমে
- গ্রুপ দাওয়াহর মাধ্যমে
- সাধারণ সভার মাধ্যমে
- লেখনির মাধ্যমে।
- ওয়াজ/তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে

দাওয়াতের পদ্ধতি : দু'টি

ক) মৌখিক দাওয়াত
খ) আচরণগত দাওয়াত

দাওয়াতে দ্বীনের পদ্ধতি : দু'টি

ক) হিকমাহ : ১। বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা ২। কোন বিতর্কে না জড়িয়ে ব্যক্তির মর্যাদা এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে নম্র ভাষায় দাওয়াত দেওয়া।

খ) মাওয়ায়েজে হাসানা : ১। শ্রোতার অনুভূতি জাগ্রত করা ২। সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সাথে উপদেশ দেয়া

দাওয়াতী কাজ কেন করতে হবে?

ক) আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ হিসেবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।
খ) আখেরী নবীর উম্মত হিসেবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

দাওয়াতী কাজ না করলে পাঁচটি ক্ষতি

১। ইলম বা জ্ঞান হারিয়ে যাবে।
২। আমলের ঘাটতি হবে।
৩। দ্বীনের উপর টিকে থাকা এবং জান্নাত লাভ করা অসম্ভব হবে।
৪। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ না করলে দুনিয়াতে আল্লাহর আযাব আসতে পারে। তখন নেককার ও বদকার সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু নেক্কার ব্যক্তিগণ পরকালে বেঁচে যাবেন।
৫। দুনিয়া এবং আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দাওয়াত দানের পদ্ধতি দুটি

ক) ব্যক্তিগত টার্গেট ভিত্তিক দাওয়াত।

খ) সামষ্টিক বা গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত।

আল্লাহর রাসূল (সা.) উক্ত দুটি পদ্ধতিতেই দাওয়াতী কাজ করেছেন।

ব্যক্তিগত ভাবে দাওয়াত

১। নিজের পরিবারে দাওয়াত
২। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে দাওয়াত
৩। পাড়া প্রতিবেশির কাছে দাওয়াত
৪। আম বা সাধারণ দাওয়াত
৫। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও শিক্ষিত লোক এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের কাছে দাওয়াত
৬। সাধারণ মুসলমানের কাছে দাওয়াত
৭। অমুসলমানদের কাছে দাওয়াত
৮। নিজের গোত্রকে
৯। মানুষের বাসায় গিয়ে

গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি

ক) পরিকল্পনা গ্রহণ
খ) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ
গ) তারিখ, দিন, সময় ও এলাকা নির্ধারণ
ঘ) গ্রুপ বের হওয়ার পূর্বে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে দোয়া করা
ঙ) কুরআন, বই-পত্র এবং প্রয়োজনীয় দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ করা
চ) গ্রুপের একজনকে গ্রুপ লিডার নির্ধারণ করা
ছ) দাওয়াত দেয়ার সময় নির্ধারিত ব্যক্তি কথা বলবে
জ) নম্র-ভদ্র ভাষায় দাওয়াত পেশ করা
ঝ) ব্যক্তিগত যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ।

দাওয়াত দানকারীদের গুণাবলি

- নিয়তের বিশুদ্ধতা
- সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে খালেস ভাবে দাওয়াত দেয়া
- নেক আমল বেশি করে করা
- সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা
- কোনো অবস্থায় রাগান্বিত না হওয়া
- বেহুদা কথা না বলা
- সংক্ষেপে কথা বলা
- সবসময় ইতিবাচক কথা বলা

দাওয়াত দানকারীর বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি

যিনি বা যারা দাওয়াতী কাজ করবেন, তাদের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি থাকতে হবে–

ক) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান থাকা
খ) অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে ধারণা থাকা
গ) কাজে ও কথায় মিল থাকা
ঘ) অস্থিরতা না থাকা
ঙ) ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু হওয়া
চ) নম্রতা, ভদ্রতা এবং বলিষ্ঠতা থাকা
ছ) মহব্বত এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত থাকা
জ) সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা থাকা
ঝ) ত্যাগী ও কর্মঠ হওয়া।
ঞ) সর্বোপরি আল্লাহর সাহায্য কামনাকারী হওয়া

দাওয়াত শুধু বই পুস্তকের মাধমে হয় না।

* দাওয়াত দানকারীর ব্যক্তিগত আচার আচরণ দেখে মানুষ বেশি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়।

যিনি দাওয়াত দেন তার বাস্তব জীবন, তার আমল-আখলাক, লেন-দেন, ওয়াদা ও অঙ্গীকার রক্ষা, আচার-আচরণ ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূল বিষয়।

দাওয়াত দানের অন্যান্য পদ্ধতি সমূহ

- সালাম বিনিময় ও পরিচিত হওয়া
- সময়, পরিবেশ ও মানসিকতা বুঝে নেয়া
- সময় চেয়ে নেয়া
- আপনার আসার কারণ ব্যাখ্যা করা
- পারস্পরিক কুশলাদি বিনিময় করা।

নবী রাসূল এবং সাহাবাদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া

১। বিতর্ক হলে উত্তম ভাবে বিতর্ক করা
২। উত্তম এবং ভালো ভালো কথা বলা
৩। বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াত দেয়া
৪। পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা
৫। উপহার বা হাদীয়া দেয়া
৬। চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাব ফেলা
৭। নিয়মিত যোগাযোগ করা
৮। মন মানসিকতা বুঝে বই পড়তে দেয়া এবং দাওয়াহর জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা। যেভাবে রাসূল (সা.) দুই উমরের জন্য দোয়া করেছিলেন।

৩৫. মুসলিম ও অমুসলিম দেশে দাওয়াতের গুরুত্ব

(১) দাওয়াতী কাজ নবী ওয়ালা কাজ। আল্লাহর বাণী সব মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া। ইহা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয কাজ। প্রসিদ্ধ চার খানা আসমানী কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে চারজন রাসূলের উপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন। তার মধ্যে তিনখানা কিতাব কেবল তাদের কওম-জাতী বা গোত্রের মানুষের জন্যে।

তাওরাত ঃ হযরত মূসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ

যাবুর ঃ হযরত দাউদ (আ.) এর উপর অবতীর্ণ

ইঞ্জিল ঃ হযরত ঈসা (আ.) এর উপর অবতীর্ণ করেন। সর্বশেষ আসমানী কিতাব শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ করেন।

কুরআন ঃ Quran সন্দেহবিহীন বা বিশ্বের সর্ব মানুষের। গোত্র-কওম ও জাতির সকলের জন্য এটা মানবতার মুক্তির সনদ সর্ব মানুষের সফলতার জন্য জীবনবিধান ও হেদায়াতের মাধ্যম।

সব আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ (Quran) কুরআনকে অনুসরণ করে চলবে। পূর্বের কিতাবেও তার কিছু ইঙ্গিত বলে দেয়া হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্বের কিতাবগুলো বাতিল বা রহিত হয়ে গেছে। সব কিতাবের অনুসারীগণ Quran- এর নির্দেশ অনুযায়ী চলার জন্যে আল্লাহ বলেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৭৫ নং আয়াত হতে ৭৯ নং আয়াতে আলোচনা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ

"নিঃসন্দেহে সর্ব মানুষের জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা।"

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্বের সর্ব মানুষের জন্য এ আদেশ ও নির্দেশনা বুঝে অন্তরে স্বীকার করে আমলে পরিণত করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। দাওয়াতী কাজ ইসলামের ভিত্তিতে দুই প্রকার (ইসলাম ছাড়া তাগুতী ও দলীয় দাওয়াত আছে)। রাসূলে আকরাম (স.) এরশাদ করেছেন- "আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। যদি তা একটি বাক্যও হয় না কেনো।" (বুখারী ১১৪ পৃষ্ঠা)

কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন–

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিৎ, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই হবে সফলকাম"। (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

"তোমার রবের পথে মানুষকে আহবান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উত্তমপন্থায় যুক্তিতর্ক কর। তোমার রবই ভালো জানেন তাঁর পথ থেকে কে বিপদগামী হবে এবং কে হবে হেদায়েপ্রাপ্ত।" (সূরা আন নাহল-১২৫)

"বলল, এটাই আমার পথ যে আমি ও আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করি। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা ইউসুফ-১০৮)

কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীসটিতে দাওয়াহ'র হুকুম এসেছে সরাসরি। এছাড়াও অসংখ্য আরো আয়াত ও হাদীস রয়েছে; যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাওয়াহ'র তাকিদ করে। এগুলোকে সামনে রেখে এবং মুসলিম উম্মাহর মৌলিক দায়িত্ব। আবার এ কাজটি প্রতিটি ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগতভাবেও ফরয তার জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুসারে।

মুসলিম দাওয়াত ঃ মুসলমান হয়েও যারা ইসলামের বিধিবিধান মানার ক্ষেত্রে অবহেলা করে; তাদেরকে পরকালে জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই মুসলিম দাওয়াহ।

অমুসলিম দাওয়াতঃ যাদের তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ও কুরআনের জ্ঞান নেই তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করাই অমুসলিম দাওয়াত।

অমুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশে এবং অমুসলিম শাসকদের দ্বারা শাসিত দেশে বসবাস করা

সাধারণভাবে জীবিকার জন্য অমুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ ও অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাওয়া উচিৎ নয়। কেননা, এতে তারা বিধর্মীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের ঈমান-আমল ও আখলাক ধ্বংস করতে পারে। রাসূল (সা.) বলেন, "মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে, আমি তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত। তিনি বলেন, মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না। তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে; অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। তবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দাওয়াতি কাজ ইত্যাদি উপলক্ষে অমুসলিম দেশে বসবাস করতে হলে নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। নিজের আমল, আখলাক দ্বারা ও সুযোগ-সুবিধামত তাদেরকে সরাসরি তাদেরকে সরাসরি ইসলামের দাওয়াত দিবে।

অমুসলিম দেশে বসবাসের সাধারণ শর্তসমূহ

অমুসলিম দেশে বসবাস বা নাগরিকত্ব নেবার আগে যে কয়েকটি শর্তের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে–

১. হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী জ্ঞান থাকা। বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার এমন ইলম, ঈমান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হবে, যা তাকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো এবং বক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো আত্মবিশ্বাসের জোগান দেয়।

২. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ঈমানী মযবুতী ও ইলম থাকা।

৩. নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে। অর্থাৎ, বসবাসকারী ব্যক্তি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ইসলামের নিদর্শনাবলি পালন করতে সক্ষম হতে হবে।

৪. মুসলিম দেশের তুলনায় অমুসলিম দেশকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করতে পারবে না।

৫. নিজের ঈমান ও আমল সঠিক ও যথার্থভাবে পূর্ণ করতে পারার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৬. নিজের আখলাক ও আমলি জিন্দেগির মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে আমলি আহবানের মত মনোবৃত্তি থাকতে হবে।

৭. ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি হবে এমন কোন কাজে জড়িত হতে বাধ্য না হবার নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৮. কোনো বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে সেখানে শক্তিশালি মুসলিম কমিউনিটি গড়ে তুলতে হবে। আরব ভুখণ্ডের বাইরে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া সাহাবীদের মতো সেখানে মসজিদ, মাদ্রাসা, দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। নিজে এবং পরিবারের সদস্যদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দিতে হবে এবং দ্বীন পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে ও দাওয়াতি কাজ করতে হবে।

উক্ত শর্ত পাওয়া গেলে অমুসলিম দেশে বসবাস করা জায়েয আছে। তবে শুধুমাত্র নিজের আয়েশ ও আরামের জন্য বা অন্যদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ব করার মনোবৃত্তিতে এমনিতে অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েয হবে না। যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম সরকারের অধীনে বসবাস করে পাপ কাজ করতে বাধ্য হয় তাদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা করে কুরআনে সূরা নিসার ৯৭নং আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় জিজ্ঞেস করলো– তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা জবাব দিল, আমরা পৃথিবীতে ছিলাম দুর্বল ও অক্ষম। ফেরেশতারা বললো: আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা কি সেখান থেকে হিজরত করে অন্যস্থানে যেতে পারতেনা? জাহান্নাম এসব লোকের আবাস স্থিরীকৃত হয়েছে এবং আবাস হিসেবে তা বড়ই খারাপ জায়গা।

অমুসলিম দেশে পড়াশোনার জন্য বসবাস করা:

গ্লোবালাইজেশনের যুগে পড়াশোনা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে পশ্চিমাবিশ্বের ভার্সিটিগুলো এবং শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে বললেও ভুল হবে না।

এজন্য সমস্ত পৃথিবী থেকেই এদেশগুলোতে শিক্ষার্থীরা ভিড় জমায়। এমতাবস্থায় মুসলিম একজন শিক্ষার্থীর জন্য অমুসলিম দেশে শিক্ষাগ্রহণ করার বিষয়টা শরিয়ীভাবে কতটুকু অনুমোদিত তা জানা আবশ্যক।

এ বিষয়ে সাধারণ শর্তাবলির সাথে বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে কোনো শিক্ষার্থী অমুসলিম দেশে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যেতে পারবে।

১ম শর্ত: ছাত্রের এমন শরয়ী 'ইলম থাকতে হবে, যার দ্বারা সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। হক দিয়ে বাতিলকে প্রতিহত করতে পারে। যাতে করে কাফিররা যে বাতিল মতাদর্শের ওপর আছে, সে তার দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে ওই মতাদর্শকে হক মনে করে না বসে, অথবা তা তার কাছে গোলমেলে হয়ে না যায়, কিংবা তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ না হয়। অন্যথায় সে দিশেহারা হয়ে যাবে; কিংবা বাতিলের অনুসরণ করতে শুরু করবে।

২য় শর্ত: ছাত্রের এমন ধার্মিকতা থাকতে হবে, যা তাকে হেফাজত করবে এবং যার মাধ্যমে সে কুফর ও পাপাচারিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। ধর্মপালনে দুর্বল ব্যক্তির জন্য ওখানে বসবাস করা নিরাপদ নয়। তবে আল্লাহ যাকে নিরাপদ রাখতে চান তার কথা স্বতন্ত্র। কেননা, ওখানে প্রতিরোধকারী দুর্বল, আর আক্রমণকারী শক্তিশালী। ওখানে কুফর ও পাপাচারিতার অসংখ্য শক্তিশালী মাধ্যম রয়েছে, যার ফলে ঈমান, আকীদা, আখলাক ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৩য় শর্ত: সে যে বিদ্যা অর্জনের জন্য সেখানে বসবাস করবে, সেই বিদ্যা অর্জনের মধ্যে মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত থাকা এবং উক্ত বিদ্যার অস্তিত্ব মুসলিমদের দেশে না থাকা। মুসলিম মহিলারা মাহরম পুরুষ সঙ্গী ব্যতীত সফর পরিমাণ দূরত্বে লেখাপড়া বা চাকরী করার জন্য যাওয়া ইসলামে জায়েয নাই।

দাওয়াতের নিয়তে অমুসলিম দেশে বসবাস

ইসলামের দিকে দাওয়াত এবং ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বসবাস করা। এটি এক প্রকার জিহাদ। সক্ষম ব্যক্তির ওপর এ কাজ করা ফরজে কিফায়াহ (যে ফরয কতিপয় আদায় করলে বাকিদের ওপর থেকে তা করার পাপ ঝরে যায়-(অনুবাদক)। তবে শর্তহলো- দাওয়াত বাস্তবায়িত হতে হবে এবং দাওয়াত প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না। কেননা, ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর এটিই রাসূলগণের পথ নবী করীম (সা.) সর্ব জায়গা ও সর্বসময়ে ইসলামের প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً "আমার পক্ষ হতে (মানুষের কাছে) একটি বাক্য হলেও পৌঁছিয়ে দাও। "সমস্ত আলেমগণ এই জায়গায় একমত যে কোনো ব্যক্তি যদি অমুসলিম দেশে এ নিয়তে বসবাস করে যে, সেখানে দ্বীনের দাওয়াত দিবে। কিংবা সেখানে বসবাসরত মুসলিমদেরকে ইসলামী হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবে, কিংবা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। এসব উদ্দেশ্যে সেখানে বসবাস করা শুধু কেবল জায়েযই নয়। বরং ছাওয়াবের অধিকারী হবে। যেমন বহু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনগণ এ ধরনের নেক নিয়তে মক্কা-মদিনা ছেড়ে অমুসলিম দেশে বসবাস করেছেন। তবে অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেবার মানসিকতা থাকলেই চলবে না। এক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং যেখানে মুসলমান বেশি থাকে, সেসব এলাকায় বসবাস করাটাই নিজের ঈমান ও আমলের জন্য অধিক নিরাপদ।

তথ্যসূত্র : ১. (আবুদাউদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)
২. (তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০, সনদ হাসান)।
৩. সহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১]

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিলো মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানো। আর রাসূলকে অনুসরণ করার মানেই হচ্ছে, যে কাজে তিনি আমৃত্যু জড়িত ছিলেন সে কাজের সাথে যুক্ত হওয়া। দাওয়াহ দ্বীনের কেন্দ্রীয় ফরজগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম ফরজ। আল কুরআনের সূরা হিজরের ৯৯নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্দেশ দিয়ে এরশাদ করা হয়েছে, চূড়ান্ত সময়টি আসা অবধারিত (মৃত্যু)। সেই সময় আসা পর্যন্ত আপনি নিজের রবের বন্দেগি করতে থাকুন।

কোন পরিস্থিতিতে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ত্যাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বসবাস করতে হবে?

যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- "তোমরা কোন্ কাজে নিমজ্জিত ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কী প্রশস্ত ছিল না, যাতে তোমরা হিজরাত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান!" (সুরা আন নিসা: ৯৭)

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন দেশে বা স্থানে কোন মুসলমানকে পাপ কাজে বাধ্য করা হবে, হারাম কাজ করতে, হারাম রিজিক উপার্জন করতে বাধ্য করা হবে তখন সেই দেশ থেকে হিজরত করে এমন স্থানে যেতে হবে যেখানে পাপ কাজ করতে বাধ্য করা হবে না।

দাওয়াহ কাকে উদ্দেশ্য করে?

কাদের উদ্দেশ্যে দাওয়াহ, এ নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। কেউ মনে করেন যারা ইসলামে আছেন তাদেরকে আবার কেন, দাওয়াত দিতে হবে? যারা এখনো ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়নি; দাওয়াত শুধু তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। আবার অনেকে মনে করেন, দাওয়াত মুসলমান ও অমুসলমান সবার জন্যই হতে হবে। দাওয়াহ'র বিষয়, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনা হয়ত ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু সবার কাছেই দাওয়াত নিয়ে যেতে হবে, তার পটভূমি যাই হোক না কেনো। মুসলমানদেরকে কুরআন-সুন্নাহের বিধিবিধান মনে চলার জন্য এবং অমুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাদের আমল-আখলাক, আকীদা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে হবে।

মূলত এ বিভ্রান্তি মানুষের সৃষ্টি করা। আল্লাহ তায়ালা দাওয়াহ'র সীমারেখা ঠিক করে দেননি? তিনি উম্মুক্তভাবে বলে দিয়েছেন– আল্লাহর পথের দিকে ডাক। শিরক যুক্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত অজ্ঞতা ও পথহারা লোকদেরকে দাওয়াত দিবে। সুতরাং সবাইকেই ডাকতে হবে। যারা এ পথ থেকে দূরে আছে, তাদেরকে যেমন ইসলামের দিকে ডাকতে হবে; তেমনিভাবে ইসলাম গ্রহণ করার পরও যাদের পদস্খলন হয়েছে, তাদেরকে আবার ডেকে পথে তুলতে হবে।

কেনো দাওয়াত দিবে

১. নিজেকে ১জন মুসলিম দাবী করে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হুকুম পালনের জন্য।
২. আখিরাতে জাহান্নাম হতে বাঁচার জন্য।
৩. নবীদের উত্তরসূরী হিসেবে নাবীওয়ালা কাজ মনে করে।
৪. শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে।
৫. জান্নাত লাভের জন্যে।
৬. আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্যে।
৭. ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে।

* দাওয়াত দানকারীর গুণাবলী :

১. নিয়তের বিশুদ্ধতা নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।
২. কুরআন ও হাদীসের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা।
৩. ধৈর্য্য ও হিকমার সাথে দাওয়াতের বিশ্লেষণ।
৪. সত্যকথা বলা ও কথায় কাজে মিল রাখা।
৫. প্রজ্ঞা খাটিয়ে নম্র, বিনয় ও সংক্ষেপে কথা বলা।
৬. কেউ রাগান্বিত হয়ে কথা বললে; তার জবাব কোমল ভাষায় দেয়া।
৭. কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে সঠিক Answer জেনে জবাব দেয়ার জন্য সময় চেয়ে নেয়া।

* দাওয়াতী কাজ করতে কী কী সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়?

১. অজ্ঞ ও নেশাগ্রস্ত লোকদের হয়রানী ও বিতর্ক।

২. ইসলাম বিরোধীদের অশুভ আচরণ।

* দাওয়াতী কাজে অগ্রসর হওয়ার পথে কী কী বাঁধা ও কেনো?

১. দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত-আখিরাতকে প্রাধান্য না দেয়া।

২. দাওয়াতী কাজকে ফরয মনে না করা ও নিজেকে অযোগ্য মনে করা।

৩. কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকা।

৪. আল্লাহর আযাবের ভয় না করা ও মিথ্যা বাহানা পেশ করা।

৫. শয়তানের ধোঁকা, পারিবারিক বাঁধা ও Media কর্তৃক ইসলাম বিরোধী মিথ্যা ভিত্তিহীন প্রোপাগাণ্ডা।

* দাওয়াতী কাজের ফজিলত

১. জান্নাত প্রাপ্তি ও মোত্তাকীর বৈশিষ্ট্য অর্জন।

২. আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন।

৩. উত্তম চরিত্রবান ও ধৈর্য্যশীলতার গুণ অর্জন।

৪. মানুষকে মাফ করে দিয়ে ক্ষমাশীল হওয়ার গুণ অর্জন।

* দাওয়াতী কাজের দশটি উপকারের কথা বলুনঃ

১. ব্যক্তিগত আমল বৃদ্ধি করা যায়।

২. নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।

৩. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও সর্বোত্তম ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি করা যায়।

৪. পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা যায়।

৫. ফরয কাজগুলো সময়মত পালন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

৬. প্রতিবেশিদের সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক বৃদ্ধি করে প্রতিবেশির হক্ক আদায় ও দাওয়াতি কাজ করা যায়।

৭. জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

৮. সবর ও তাকওয়া বৃদ্ধির ফলে প্রজ্ঞা খাটিয়ে কৌশলে দাওয়াতি কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

৯. মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

১০. আমলিয়াত বাড়িয়ে জান্নাত লাভ করার সুযোগ তৈরি হয়।

বি. দ্র. সকল নবী ও রাসূল (আ:) যেমনিভাবে মেষ-ছাগল চড়িয়ে ধৈর্য্যের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে ধৈর্য্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন ঠিক তেমনি দায়ী ব্যক্তি দাওয়াতী কাজে অনুরূপ ধৈর্য্যের পরিচয় দিবেন।

দেশে-বিদেশে (ইউরোপ আমেরিকায়) দাওয়াতী কাজ করার জন্য বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা–

১. ইসলামিক দাওয়াহ কাজ করার জন্য বৎসরে তিনটি Open day & Exibition আয়োজন করা। তা হতে পারে (ক) মসজিদে (খ) মাদ্রাসায় (গ) ইসলামিক সেন্টারে (ঘ) কমিউনিটি সেন্টারে (ঙ) খোলা মাঠে।

২. বৎসরে ২টি Lunch বা dinner এর আয়োজন করা এবং মসজিদ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।

৩. বৎসরে ১২ মাসে ১২টি (a) Tea & Tour বা Coffee Morning & My Neighbour Project (c) Distribution of food and clothes to the Homeless & needy people. (d) Visit the ill, sick and old people (e) Set Food Bank.

* দাওয়াতের মাধ্যমে (a) সাধারণ সভা (b) ওয়াজ মাহফিল (c) মাইকিং ও রেডিও টিভি (d) গ্রুফ দাওয়াত (e) Email (f) Message (g) WhatsApp (h) Social Media (i) Twin tore (j) Lecture (k) Leaflet/Handbill (l) Paper (m) Postering.

কিসের দাওয়াত কাদেরকে দিবে?

আল্লাহর দিকে, ইসলামের ও কুরআন হাদীসের দিকে শিরকযুক্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত অজ্ঞতা-পথহারা লোকদেরকে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধের জন্য দাওয়াত দিতে হবে। খারাপ আচরণের বদলায় ভালো আচরণ, ভালো ব্যবহার ও কোমল আচরণের সাথে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে ধৈর্য্যর মাধ্যমে দাওয়াত করতে হবে। অন্য ধর্ম পালনকারীদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। সাথে সাথে সমাজের নেতা, School, College, University teacher, Office Colleague,Chariman / Meyor, MP, Minister, Actor, etc.।

* দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করার পূর্বে করণীয় ও পূর্ব প্রস্তুতি :

১. আল্লাহর নাম স্মরণে দাওয়াত আরম্ভ করা।

২. দাওয়াত দানকারীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করা:

৩. কতজন Volunteer দাওয়াত করবেন তার সংখ্যা নির্ণয় করা

৪. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে দাওয়াত দেয়া।

৫. দাওয়াতী সামগ্রী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হওয়া। যেমন–
1. Dawah Stand 2. Dawah table 3. Uniform 4. Leaflet 5. Sound Box 6. English translatiou Quran (কুরআন) 7. Posters and other Dawah materials.

৬. দাওয়াত পরিচালনা করার জন্য আমীর নিয়োগ করা।

৭. আমীরের দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন Point এ দাওয়াত দেয়া।

৮. নির্দিষ্ট সময়ে দাওয়াত আরম্ভ ও সমাপ্ত করা।

৯. দাওয়াতরত অবস্থায় নিজেদের টেলিফোন বন্ধ রাখা।

১০. এক হাতে টেলিফোনে কথা বলা, অন্য হাতে দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ না করা।

১১. দাওয়াতরত অবস্থায় এক Volunteer অন্য Volunteer এর সাথে গল্পে লিপ্ত না হয়ে অনুচ্চ স্বরে আল্লাহর যিকির ও দোয়ায় মশগুল থাকা।

১২. দাওয়াতরত অবস্থায় কেউ চলে যেতে চাইলে আমীরের অনুমতি নিয়ে চলে যাওয়া।

১৪. দাওয়াতীকাজে ভুল-ত্রুটির জন্য ইহতেসাব ও দোয়ার মাধ্যমে দাওয়াহ সমাপ্ত করা।

১৫. দাওয়াহ সমাপ্তিকালে সবাই মিলে দাওয়াতী সামগ্রী গুটিয়ে সঠিক স্থানে নিয়ে রাখা।

৩৬. আদর্শ সন্তান গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। শিশুর সুষ্ঠ সুন্দর পরিগঠনের উপর নির্ভর করে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ। সকল মা বাবা চায় তাদের সন্তানাদি চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠুক। কিন্তু মা-বাবার ঐকান্তিক কামনা সত্ত্বেও ছেলে-মেয়ে আশানুরূপ চরিত্র নিয়ে অনেক সময় গড়ে উঠে না। তার কারণ- সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে মা-বাবা পরিবার ও পরিবেশের ভিন্নতা। কোনো মা বাবা সন্তানের দুনিয়াবী কষ্ট সহ্য করতে পারে না। সন্তানাদি যদি সৎ চরিত্রবান না হয়, সৎ ও সুনাগরিক হয়ে গড়ে না উঠে, খাঁটী ঈমানদার না হয়, তা হলে মা-বাবা অশান্তিতে জ্বলে মরে যে, পরকালে সন্তানের কী হবে সে ব্যাপারে মুসলিম মা-বাবা পেরেশানিতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রত্যেক সন্তাদেরকে সুন্দর ও সৌরভময় ফুলের মত করে গড়ে তোলার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তায়ালা সূরা আততীনের ৪ হতে ৬ আয়াতে বলেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

"আমি মানুষকে অতি উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি। অতপর তার অকৃতজ্ঞতার কারণে, আমি তাকে সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করব। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত যা কোনো দিন শেষ হবে না।"

উপরিউক্ত কুরআনের নির্দেশের আলোকে যে সকল মাতা-পিতা নিজে ঈমান এনে সে অনুযায়ী সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে পরিচালনা করবে, তাদেরকে আল্লাহ আখিরাতে জান্নাত দান করবেন।

আদর্শ শিক্ষার উপর নির্ভর করছে শিশুর আদর্শ জীবন। কাজেই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের থেকে বা পরিবার থেকে শুরু করতে হয়। শিশুকে গঠন করার জন্য শিশুর মাতাকে সন্তানের জননী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ভুল জ্ঞান দিয়ে কুরআন হাদীস মোতাবেক সন্তানকে শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। মহান রাব্বুল আলামীন মানব জাতির প্রতি অসংখ্য অফুরন্ত জ্ঞানদান করেছেন। পৃথিবীতে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল জীবন বিধান– আল কুরআন। সে কুরআনের ঘোষণা-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

"এই সে গ্রন্থ আল কুরআন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে- এই কিতাব কেবল তাদের জন্য পথ প্রদর্শক।" (সূরা বাকারা : ২-৩)

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক সন্তানই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতপর তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।" (সহিহ আল বুখারী)

রাসূল (সাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম, সে সব জিনিস তাদের উপর হারাম করে দেয়।" (সহীহ মুসলিম ২৮৬৫ নং)

পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ইসলাম মাতার ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে। মায়ের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) গর্ভধারণ অবস্থা (২) শিশুর শৈশব অবস্থা (৩) যৌবন অবস্থা।

গর্ভধারণ অবস্থায়

এ সময় গর্ভে সন্তান ধারণ করে দীর্ঘ ৯-১০ মাস পর্যন্ত একজন মাতাকে অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। একমাত্র সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করে একজন মাতা তার শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাকে তুচ্ছ করে নিষ্ঠার সাথে কর্ম পালন করেন। অনেক কষ্ট-দুঃখ, বেদনা সহ্য করে গর্ভস্থ সন্তানের নিরাপত্তার জন্য সর্বক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করে চলেন। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মাতাকে সদা প্রফুল্ল অসৎ চিন্তা মুক্ত সাবলিলভাবে সাংসারিক কর্মে লিপ্ত থেকে কুরআন, হাদীস, ও নবী-রাসূলের সুমহান জীবনী বেশি বেশি পাঠ করা আবশ্যক। না হলে সন্তানের উপর আসর পড়ে না।

মা দ্বীনি হলে, গর্ভের সন্তানও দ্বীনি হবে। সন্তান গর্ভে রেখে মাতা টিভি নাটক, সিনেমা না দেখাই উত্তম। গান বাজনা না শুনে ওয়াজ নসিয়ত শোনাই মুমিনের লক্ষণ। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মাতাকে পর্দা মেনে চলতে হবে। সর্বদাই অজুর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে কুরআন তিলাওয়াত, ফরয নামাজের পাশাপাশী নফল নামাজ, তাসবিহ, যিকির দৈনিন্দিন মাসনুন দোয়া, নবী রাসূলদের জীবনী, ইসলামী সাহিত্য ও কুরআনের তাফসীর পড়ে গর্ভের সন্তান দ্বীনদার হওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে। বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে। মায়ের নেক আমলের প্রভাবে সন্তান দ্বীনদার ও নেক সন্তান হিসেবে দুনিয়ায় আসবে।

জন্মের পর আদর্শ সন্তান গঠনে পিতামাতার ১২টি দায়িত্ব বা হকঃ

১। দুকানের নিকট আজান দেওয়া।
২। তাহনিক করা বা মধু-মিষ্টি জাতীয় বা খুরমা খেজুর চিবিয়ে মুখে দেওয়া।
৩। সুন্দর ইসলামী অর্থবোধক নাম রাখা।
৪। মথার চুল মুণ্ডন করা।
৫। ৭ দিনের মাথায় আকিকা করা (ছেলে সন্তান হলে ২টি বকরী, কন্যা সন্তান হলে ১টি বকরী)।
৬। ছেলে সন্তান হলে খতনা করানো।
৭। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করা।
৮। ইসলামী আকিদায় কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৯। সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করা।
১০। সাত বৎসর বয়সে নামাজের জন্য তাগাদা করা।
১১। দশ বৎসর বয়সে নামাজের আদেশ করা- নামাজের আদেশ লঙ্ঘন করলে মৃদু প্রহার করা।
১২। বিবাহের বয়স হলে তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিবাহের ব্যবস্থা করা।

এই বারটি বিষয়ে সন্তানদের বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আদর্শ মুসলমান হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা পিতামাতার একান্ত কর্তব্য।

জন্মের পর হতে শিশুর শিক্ষা শুরু

প্রত্যেক সন্তান দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। দুনিয়াতে আসার পর মাতা পিতার ধর্ম অনুযায়ী ধর্মালম্বী হয়। কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান হয়ে যায়।

৫ মাস বয়স হতে শিশু মাতা পিতার কথা বুঝতে শিখে। ৮ মাস বয়স হতে আব্বা-আম্মা (আল্লাহ) দিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করে। ১ বৎসর বয়স হতে হাঁটতে শিখে, ২ বৎসর বয়স হতে অনর্গল কথা বলতে শুরু করে।

এই বয়সে সন্তানের ঘরের পরিবেশ যদি ইসলামিক পরিবেশ হয়ঃ

ঘরোয়া পরিবেশ ভাল হলে সন্তান ভালো হিসাবে গড়ে উঠবে। যেমন: পিতামাতার কথাবার্তা সৌন্দর্য্য, শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা। একে অপরকে শ্রদ্ধা সুলভ আচরণে সম্বোধন করা। ভদ্রতা, নম্রতা, নমনীয়তা, কোমলতা, দয়াপরায়ন, ধৈর্য্যশিলতা, কাজে কর্মে একে অপরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। পিতা-মাতার সহীহ আকিদা, ভালো আখলাক বা চরিত্র থাকতে হবে। নিয়মিত ওয়াক্ত মত নামাজ (জামায়াতে) পড়া। কুরআন অধ্যয়নে দৈনিক রুটিন অসুসরন করে চললে, পিতামাতার ভালো চাল-চলনে সন্তানের উপর আচর করবে এবং সন্তান ইসলামী চরিত্রে বড় হয়ে ইসলামকে অনুসরণ করে চলবে।

আবার এ বয়সে সন্তানের ঘরের পরিবেশ যদি অনইসলামিক হয়ঃ

ঘরোয়া পরিবেশ খারাপ হলে সন্তানের পিতামাতা একে অপরকে মান্য করে না চললে, কথায়-কথায় উচ্চ বাক্য, গরম মেজাজে অভদ্র আচরণ দেখানো, গালিগালাজ, ধমকা-ধমকী, মারামারী, শালীন পোশাক পরিধান না করে অনইসলামিক পোষাক পরিধান, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন, ধূমপান, মদ্য পান করলে, বংশীয় বড়ত্ব ও অহংকারে সংসার ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি দিয়ে (স্বামী-স্ত্রী) একে অপরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া অবস্থায় সন্তান বড় হতে থাকবে। বড় হয়ে সন্তান পিতামাতার মত খারাপ আচরণ করতে বিন্দু মাত্র ইতস্ত করবে না। এমতাবস্থায় একজন ভাল মুসলমান হিসাবে সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যিনি আগে কথা বলার জন্য উদ্যোগ নিবেন– আল্লাহ ও রাসূলের ভাষায় তিনি শ্রেষ্ঠ, মহান ও উত্তম। সব সময় নিজেকে ছোট ও কম জ্ঞানী মনে করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মনে রাখতে হবে ৩ দিনের বেশি স্বামী-স্ত্রী কথা বলা বন্ধ রাখলে শয়তান বেশি খুশি হয়ে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী যিনি আগে কথা বলবে, তিনি সালাম দিয়ে কথা আরম্ভ করবেন। হাশি মুখে জবাব দিয়ে উভয়েই আলাপ চারিতা চালিয়ে যাবেন।

সন্তানদেরকে আদর্শ মুসলমান হিসাবে গঠনের জন্য পিতামাতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞ ও সচেতন পিতামাতা সন্তানদেরকে ভালো চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে পরামর্শ ভিত্তিক কিছু পরিকল্পনা ও কৌশল অসুনরন করা উচিত। তা হল:

আদর্শ সন্তান গঠনে শুভ ফল পাওয়া জন্য প্রত্যেক মাতা-পিতাকে ৩টি স্তরে ৭ বছরকে ব্যবহার করতে হবে (৩×৭ = ২১ বৎসর)

(ক) সন্তানের এক বৎসর বয়স হতে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আদর ও খেলাধূলার মাধ্যেমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে (১-৭) বৎসর।

(খ) সন্তানের সাত বৎসর বয়স হতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া ও বাস্তবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে (৭-১৪) বৎসর।

(গ) সন্তানের চৌদ্দ বৎসর বয়স হতে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখাপড়া, বাস্তবতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে দরদী মনে পিতামাতা তাদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে (১৪-২১) বৎসর।

সন্তানের ১ বৎসর হতে ৭ বৎসর পর্যন্ত বাল্য প্রশিক্ষণ

সন্তানের বাল্য শিক্ষা বা প্রথম প্রশিক্ষণঃ

সন্তানকে বাল্য বয়স হতে আদর্শ শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শিশুকাল হতে সন্তানের কচি মনে (দ্বীনি) ইসলামের প্রেরণা জাগ্রত করা মাতা পিতার কর্তব্য। ছোট সন্তানের মুখে যখন কথা ফুটে, তখন হতে আল্লাহর নাম, রাসূলের নাম, সালাম দেয়া, কালেমা তাইয়্যেবা, ছোট ছোট সূরা মুখস্ত করানো এবং তাওহীদ শিক্ষা দেয়া মাতা পিতার কর্তব্য।

সন্তানের বয়স যখন ৫-৬ বৎসর, তখন হতে দ্বীনি শিক্ষার জন্যে মসজিদে ও মক্তবে পাঠাবেন। সাথে পরিবারের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল হিসেবে ইসলামী আদব কায়দা শিখাবেন। শিশুদের বয়স ও মেধার উপর লক্ষ্য রেখে কতিপয় দোয়া শেখাতে হবে। খাবার ডান হাতে ডান দিক হতে বিছমিল্লাহ বলে খেতে হয়। খাবার শেষের দোয়া। ঘুমাতে যাওয়ার দোয়া, ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর দোয়া। দৈনন্দিনের মাসনুন দোয়াগুলো ঘরোয়া পরিবেশে শেখানোর চেষ্টা করতে হবে।

আমরা মুসলমান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার হুকুম মানা আমাদের কর্তব্য। তিনি রিজিকদাতা, হায়াত মউতের মালিক। সময় সুযোগ ফেলে তাদেরকে মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়ার জন্যে আপনার সাথে নিয়ে যাবেন। মসজিদের আদব, মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দোয়া শিখাবেন। মসজিদে প্রবেশ কালে ডান পা, বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হয়ে দোয়া পড়তে হয়।

এভাবে সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয় যাত্রাকালে শিক্ষা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে অভ্যাস গড়ে তুলবেন। নবী-রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের কিসসা কাহিনী ও তাঁদের চরিত্র কেমন ছিল, তা শিশুরদেরকে শোনাতে হবে, নবী-রাসূল, সাহাবী তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ীদের জীবনীর উপর ছোটদের জন্য লেখা বইপত্র পড়তে দিতে হবে। তাদের চরিত্র আমাদের চরিত্রের মাঝে ফিট করতে হবে। এ বয়সে সন্তানদেরকে যা শিখাবেন বড় হয়ে তারা তাই আমল করবে। তাদেরকে সর্বদা সত্য কথা বলা শেখাতে হবে। শেখাতে হবে যে, 'মিথ্যা' বলা মহাপাপ। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা ছোটদেরকে আদর করা। ওয়াক্তমত নামাজ পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন। বয়স হলে ফরয রোজা রাখতে হবে। আল্লার নির্দেশ পালন না করলে মরার পরে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করলে জান্নাত লাভ করা যাবে। এইসব জিনিস শেখা অবস্থায় সন্তান বড় হতে থাকবে।

সন্তানগণ বড় হওয়ার প্রাক্কালে তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। সাথে সাথে চাঁদের বুড়ি ও ভূতের গল্প না শুনিয়ে, মিনা কার্টুনের মতো কার্টুন না দেখিয়ে কুরআনের গল্প শোনাতে হবে। মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম (আ.), ইসমাইল (আ.), নূহ (আ.), ইউছুফ (আ.), ইউনুছ (আ.) ও লোকমান হেকিম তার সন্তাদেরকে কি কি উপদেশ দিয়েছেন; তার আলোচনা শুনিয়ে পরিশেষে সর্বশেষ আখেরী পয়গাম্বর ও শেষ নবীর সুমহান ও আদর্শ চরিত্র শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কী কী নেয়ামত দিয়েছেন, কীভাবে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে কতো ভালবাসেন। আমাদের উপকারের জন্য কী কী জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইবাদাত করলে কী লাভ, না করলে কি ক্ষতি ইত্যাদি সব তাদের মনে জাগ্রত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা পৃথিবীর যেখানে যা কিছু করছি: ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য সবই আল্লাহ দেখেন এবং জানেন। কী উদ্দেশ্যে আমরা কী কাজ করি, মনে-মনে আমরা কি চিন্তা করি ইত্যাদি বিষয়গুলি দুনিয়ার কেউ জানেনা। কিন্তু আল্লাহ আমাদের মনের গোপন চিন্তা, নিয়ত, উদ্দেশ্য, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সকল কাজের বিষয়ে সব কিছুই

জানেন। আল্লাহর ফেরেশতারা আমাদের সকল কথা ও কাজ রেকর্ড করছেন। ভিডিও করে রাখছেন। যাতে আমরা পাপ-পুণ্যের যত কাজ করেছি; তা আমাদেরকে দেখিয়ে তার সুবিচার করতে পারেন। কর্মফল অনুযায়ী পুরস্কার (জান্নাত) এবং শাস্তি (জাহান্নাম) দিতে পারেন। আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখার পর আমাদের কোন কাজ অস্বীকার করতে পারবনা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কী উদ্দেশ্যে কেন সৃষ্টি করেছেন; এ ব্যাপারে সূরা আয্ যারিয়াহ এর ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ "আমি জিন ও মানব জাতীকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" সে ইবাদত না করলে মরার পরে আমাদের কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। ছোট-বড়, রাজা-বাদশা, ফকির-মিসকীন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল প্রানীকেই একদিন মরতে হবে। মরার পরে সবাই আল্লাহর Immegration পার হতে হবে। আখেরাতে আল্লাহর Immegration Visa না পেলে মরার পর হতেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। জাহান্নামের ভয়াবহ কষ্টের কথা সন্তানদেরকে জানিয়ে দিতে হবে।

সে জাহান্নাম হতে বাঁচার জন্য কী কী কাজ করতে হবে। সে ব্যাপারে সন্তানদেরকে তারবিয়্যাহ দিতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে- দুনিয়া মুমিনদের জন্য জেলখানা এবং আখেরাতের শস্য ক্ষেত্র। কাফের ও মুনাফেকরা দুনিয়াতে আল্লাহর ভয় করে চলে না বলে আখেরাতে তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

এই ভাবে ক্রমান্বয়ে তাদের বাল্য শিক্ষাএক হতে সাত (১-৭) বৎসরের প্রথম প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে। আদর-সোহাগ, ভালোবাসা ও খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের প্রথম প্রশিক্ষণ শেষ হবে।

সন্তানের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ আরম্ভ

সাত হতে চৌদ্দ (৭-১৪) বৎসরের মধ্যে যখন তারা প্রাইমারি ও হাই স্কুলে লেখাপড়া অবস্থায় থাকবে; এই বয়সের প্রশিক্ষণের পূর্বে সন্তানদেরকে বাল্য শিক্ষাগুলো পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। যাতে করে তারা আজীবন এ শিক্ষা মনে রাখতে পারে। প্রশিক্ষণের প্রারম্ভেই সর্ব প্রথম আল্লাহর পরিচয়। তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য মুসলমান কাকে বলে, তার কাজ কী? মুসলিম, মুনাফিক ও কাফেরদের মধ্যে কি পার্থক্য, হালাল হারামের গুরুত্ব, শয়তানের পরিচয়, জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। কুরআনের পরিচয়, কুরআন তেলাওয়াত, নামাযে যেই সব সুরা-কিরাত, দোয়া পাঠ করা হয় তার অর্থ শিক্ষা দিতে হবে। আমাদের আখেরী নবীর চরিত্র, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য, পাপ-পুণ্য, ভাল-খারাপ ইত্যাদি বুঝাবেন।

উপরিউক্ত কথাগুলো শান্ত-কোমল ও নরম ভাষায় মহব্বতের সাথে খেলা-ধূলার মাধ্যমে, আনন্দের মাঝে রেখে কখনো মসজিদে, কখনো রাস্তায় বা যানবাহনে চলার সময়, কখনো খেলার মাঠে, কখনো একাকী, কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনো তাদের মায়ের সামনে শেখানোর চেষ্টা করুন। সন্তানদেরকে বন্ধু বানানোর চেষ্টা করুন। যাতে তারা নিজের মনের থেকে আপনার কাছে অনেক কিছু জানার জন্য আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞেস করে। তাদেরকে কখনো ধমক দিবেন না, ভয় দেখাবেন না, আশা-ভরসা, আল্লাহর রহমত, ক্ষমা পরায়নতা ইত্যাদির কথা বলতে হবে। তারা যাতে করে আপনাকে খেলার সাথী মনে করে, মাঝে মধ্যে তাদের থেকে পরামর্শ নিয়ে কাজ করবেন। এর ফাঁকে তাদেরকে কিছু মৌখিক Home Work দিয়ে দিবেন। ঠিকমত Home Work সমাপ্ত করলে বাহবা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে (Gift) পুরস্কার দেয়ার চেষ্টা করবেন। সর্বদাই তাদেরকে আনন্দে রাখবেন। সন্তানদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে বয়সের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দিনের পর দিন অল্প অল্প করে আনন্দ ও খেলাধূরার মাধ্যমে কিছু শেখালে সেটা তারা মনে রাখতে কষ্ট হবে না; বরং বেশিদিন তা সন্তানদের স্মরণে থাকবে।

আমাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদতের জন্যে। তাই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাথা হতে পা পর্যন্ত, আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ স: এর সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। তার বিপরীত চলতে গেলে আমরা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আখেরাতেও বরবাদ হব। দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির জন্যে নিজেদের ঘরটিকে পারিবারিক মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আমল বৃদ্ধি করার জন্য পারিবারিক বৈঠকের (Family Meeting) আয়োজন করতে হবে।

ছুটির দিনে সন্তানদের প্রশিক্ষণের রুটিন

সন্তানদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন (School, College & University) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি আরম্ভ হলে মাতা-পিতা (Family Meeting) পারিবারিক বৈঠকের মাধ্যমে সন্তানদের পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে রুটিন তৈরি করুন। দেখবেন এতে সন্তানগণ আগ্রহসহকারে সে রুটিন বাস্তবায়ন-এ সচেষ্ট থাকবে।

তবে এ রুটিন তৈরি করার পূর্বে পিতা-মাতার আকিদা-আখলাক ত্রুটিমুক্ত করে সঠিক কাজ সময়মত সমাধান করার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে হবে। মাতা-পিতা সর্বদাই আল্লাহর নির্দেশিত পথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করে আমলীয়াতের মাধ্যমে দৈনন্দিন কিছু সময় সন্তানদের জন্য ব্যয় করার পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করবেন। কখনোও গণমাধ্যমে, মিডিয়া, Facebook, Mobile Phone, TV দেখে ওয়াক্তমত নামাজ পড়া হতে গাফেল না হয়ে, এক ওয়াক্ত নামাজের পর আরেক ওয়াক্ত নামাজ জামাআতে পড়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে। তা হলে সন্তানগণও মাতা-পিতার কাজ কর্ম অনুসরণ করে তাদের চরিত্র গঠন করবে।

ছুটির সময় দৈনন্দিন রুটিনের কিছু তালিকা নিম্নরূপ–

১. সময় মত ৫(পাঁচ) ওয়াক্ত নামাজ জামাআতে আদায় করা-

২. কুরআন হাদীস অনুযায়ী শিরক ও বিদয়াত মুক্ত ইবাদত করা।

৩. প্রত্যহ জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন ও হাদীসের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা।

৪. স্কুল (School কলেজ College ও University Home work সমাধান করে ঘুম ও বিশ্রামের সময়-নির্ধারণ করা।

৫. পিতা-মাতার আদেশ পালন ও সেবা করে পারিবারিক কাজে তাদেরকে সাহায্য করা।

৬. খাওয়া, বাইরে বেড়াতে যাওয়া, খেলাধূলা ব্যায়াম ও ব্যক্তিগত কাজের সময় নির্ণয় করা।

৭. কার্জে-কর্মে, চলাফেরায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ স্মরণে যিকির ও দোয়া করে পর্দার বিধান মেনে চলা।

৮. Computer, TV ও Mobile Phone, Facebook বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করে সময় নষ্ট না করা। নামাজী লোকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে দাওয়াতী কাজ করা।

৯. পরিবারভুক্ত সকল সদস্য রুটিন বাস্তবায়নের পর মাসনুন দোয়াগুলো নিয়মিত পড়ায় সহযোগিতা করা।

১০. দিন শেষে কাজের মাঝে ঘটে যাওয়া, পাপ, অন্যায় ও শয়তানী কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ঘুমাতে যাওয়া।

১১. মানুষের ২৪ ঘণ্টাই ইবাদত, যদি প্রত্যেকটি কাজ আরম্ভের আগে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। ছুটিতে ঘরটিকে ইসলামী মাদরাসায় তৈরি করতে পারলে ছুটির দিনগুলো স্বার্থক হবে।

পিতামাতার উপরিউক্ত উপদেশগুলো বাস্তবায়ন করে কথায় কাজে মিল রেখে সন্তানদের সাথে কাজ করবেন। এ বয়সের সন্তানদের সাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাসায় ফিরে আসলে তাদের সাথে একই টেবিলে বসে খাবার খাবেন তাদের খেলার সাথী কারা ভাল খারাপ পর্যালোচনা করুণ। তাদেরকে মহব্বত দিয়ে নিজের বন্ধু বানানোর চেষ্টা করে সব প্রকাশ্য গোপন, ভাল-খারাপ কথা জানার চেষ্টা করুন।

সব কথা শোনার পর তাদেরকে আদরের সাথে নরম সুরে দৈনিক কিছু কিছু পরামর্শ দিবেন যে, আমরা মুসলমান এ কাজ আমাদের করণীয়, এ কাজ বর্জনীয়। এটা হালাল, এটা হারাম। ইসলামী আদব কায়দা, বড়দের সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়। ছোটদেরকে কীভাবে আদর করতে হয়। প্রত্যেকটি ভাল কাজ শেখাতে পিতামাতাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। খারাপ কাজ তাদেরকে শেখাতে হয় না। খারাপ তারা সহজে শিখে ফেলে।

সন্তানেরা পরের দিন কলেজ-ইউনির্ভাসিটি হতে ঘরে আসলে আজও একত্রে একই টেবিলে বসে খাবেন। পূর্বের দিনের আলোচনা পুনরাবৃত্তি করুন। দৈনিক তাদের সময় না হলে সপ্তাহের যে কোনো দিন সন্তানদের পরামর্শক্রমে পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করুন। ঐ পারিবারিক বৈঠকের এজেন্ডা তৈরি করুন। দৈনিক একটি বা দু'টি হাদীস পড়ুন। তারপর হাদীস নিয়ে সবাই পর্যালোচনা করুন। কে কি বুঝেছে জানার চেষ্টা করুন।

আপনার ঘরকে একটি প্রাথমিক মাদরাসা বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। পরের সপ্তাহে পুরাতন হাদীস তাদের মনে আছে কিনা একটু আলোচনা করে নতুন একটি হাদীস আপনার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে পড়তে দিন। ইসলামী চরিত্র গঠনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করুন। নামাজের সময় আপনিসহ মসজিদে গিয়ে জমায়াতে নামাজ পড়ুন। পরের সপ্তাহে কলেজ-ইউনির্ভাসিটি হতে তারা বাসায় ফিরে আসলে তারা ওয়াক্ত মত নামাজ পড়েছে কীনা? স্ত্রী ও মেয়েরা ঘর থেকে বের হলে পর্দা করে চলে কীনা? ইত্যাদি জেনে নিন ও সৎ পরামর্শ দিন।

পরের সপ্তাহিক পারিবারিক বৈঠকে কোন দিন কী খাবেন তালিকা করুন। কোথায় খাবেন? রেস্টুরেন্টে না বাসায় খাবেন? কোন দিন কে রান্না করবে, সন্তানদেরকে রান্না শিখাবেন। ছোট মনে করে আদর করে রান্না হতে দুরে রাখবেন না। মেয়ে সন্তানদেরকে অবশ্যই বিয়ে দেওয়ার আগে ভালো করে রান্না শিখিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবেন।

মনে রাখবেন সন্তানদেরকে রান্না শিখানোর প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে নামাজ যাতে করে কাযা না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সর্বদাই সব কাজের উপর আল্লাহর নির্দেশ নামাজকে বেশি প্রাধান্য দেবেন।

পরের সপ্তাহের পারিবারিক বৈঠকে আপনার সন্তানদেরকে বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোচনা করতে দিন; বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিজের হাতে তাদের আলোচনা লিখে দেবেন। যেমন- ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া, দাওয়াত, ধৈর্য্য, পরামর্শ, গীবত, অহংকার ইত্যাদি। সকাল সন্ধ্যার মাসনুন দোয়া ছোট ছোট সূরার অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে আলোচনা করতে দিন। সন্তানেরা আলোচনা করবেন, মাতা-পিতা তাদের শ্রোতা হবেন। আলোচনার মাঝে ত্রুটি, কম আওয়াজ হলে, আওয়াজ বাড়িয়ে বলার জন্য পরামর্শ দিবেন।

আপনার সন্তান যখন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, তখন তারা সম্পূর্ণ যবক-যুবতী ঝুঁকিপূর্ণ বয়স। এ বয়সে সতর্কতা ও কঠোর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে তদারকী বা পরিচালনা করার জন্য কোমল ব্যবহারে বন্ধু হওয়া আবশ্যক। সন্তানদের মনে আখেরাতে জাহান্নামের ভয় জাগ্রত হলে মাতাপিতার মৃত্যুর পরও তা অব্যাহত রাখবে।

আপনার প্রত্যেক পরামর্শ ও আদেশ তারা যাতে করে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, সে পরিবেশ তৈরি করুন। ঘরোয়া পরিবেশে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, পুরুষ মানুষ কেন মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ে। মেয়েরা কেন পর্দা করে? উত্তর তাদের থেকে সংগ্রহ করে আপনার কুরআনিক জ্ঞানে বলুন- মসজিদ আল্লাহর ঘর। সেখানে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় করা যায়। আখিরাতে বাড়ি তৈরি করে সে ঘরকে সৌন্দর্য্য করা যায়। সে নামাজে আল্লাহকে সিজদা করে নিজের সকল অভাব, দু:খ আবেদন-নিবেদনের দরখাস্ত করে আপনিও আপনার সন্তনদেরকে মরার পরে আখিরাতে যাওয়ার পথ পরিস্কার করুন।

১৪ বৎসর বয়সে সন্তানগণ ৯বম/দশম শ্রেণি অতিক্রম করে কলেজে যাবে। তখন তাদেরকে (হজ্জ) ওমরা করার জন্যে পবিত্র ভূমি মক্কা-মদীনায় নেওয়ার পরিকল্পনা করুন। যে কা'বার দিকে কেবলা, নির্ণয় করে তারা নামাজ পড়ে তা স্বচক্ষে দেখলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। একত্রে টাকার ব্যাবস্থা না করতে পারলে মাস মাসে জমা করে তা সফল করুন। এ ভাবে আপনাদের সন্তানদের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ এর বয়স শেষ হয়ে তৃতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আরম্ভ হবে।

তৃতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: ১৪-২১ বৎসর বয়স:

এ বয়সে পিতামাতা সন্তানদেরকে বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে হবে- যাতে করে তারা আগ্রহ সহকারে উৎসাহ নিয়ে শিক্ষা নিতে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এ বয়সের শিক্ষা সর্বোচ্চ শিক্ষারত অবস্থায় আদর্শ মুসলমান এর কী করণীয় ও বর্জনীয়, কোন কাজে আল্লাহ খুশি, কোন কাজে আল্লাহ বেজার বা অসন্তুষ্ট, কী কাজ করলে জান্নাত ও কী কাজে জাহান্নাম তা শিক্ষা দিতে হবে। হালাল-হারামের তালিকা করে রুটিনে এনে আমলে পরিণত করানোর জন্য চেষ্টা করা পিতামাতার একান্ত আবশ্যক।

লেখাপড়ারত অবস্থায় সন্তানদেরকে ইন্টারনেট বিহীন মোবাইল ফোন দেওয়ার পরিকল্পনা করলে তারা ভালো রেজাল্ট ও ভালো মুসলমান হিসাবে গড়ে উঠবে।

২৫শে ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বড় দিনে, ৩১শে ডিসেম্বর রাতে, নব বর্ষ বরণ, হিন্দুদের ১২ মাসে তের পূজা, জন্ম দিন, মৃত্যু বার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, আশুরা ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসব পালনের বিষেয়ে ইসলামের শিক্ষা ও মুসলিম সংস্কৃতি কী হওয়া উচিত তা সন্তানদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মূর্তি পূজা মানে আল্লাহর সাথে শিরক করা- শিরককারীগণ জাহান্নামী। ধর্ম যার যার উৎসব সবার-এ কথাটি কুফরী ও শয়তানী মতবাদ। মুসলমানেরা অন্য ধর্মের উৎসবে গেলেও অন্য ধর্মের লোকরা মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করে কী না তা ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক।

১। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম– সূরা আল ইমরান: ১৯।

২। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন– সূরা আল বাকারা: ২০৮।

৩। হে ঈমানদারগণ তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করিও না– সুরা আল ইমরান: ১০২।

৪। "হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচ এবং তোমাদের আহালকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।" (সূরা আত তাহরীম: ৬)

৫। আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য– (সুরা আনয়াম:১৬২)

এ কয়েকটি কুরআনের আয়াতের আলোকে আমাদের সাড়ে তিন হাত শরীরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচানো এবং সাপ্তাহিক কুরআন ও হাদীসের তারবিয়াহ দিয়ে সন্তানদের মতামতের ভিত্তিতে আজীবনের জন্য সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা। তা আর পারিবারিক বৈঠকে তারবিয়াহ অব্যহত রাখতে হবে এবং সন্তানদের জন্য দোয়া করতে হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আপনার সন্তনদেরকে মোবাইলে ইন্টারনেট অপব্যবহার করার বিষয়ে সন্তনদেরকে সাবধানে ও সতর্ক করতে হবে। তাদেরকে বার-বার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে– যত গোপনেরই আমরা খারাপ কাজ করি না কেনো তা আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা দেখেন ও রেকর্ড রাখেন। আর ভালো কাজ করলে তাও রেকর্ড রাখেন। আমাদের সকল কাজের জন্য পরকালের আল্লাহর নিকট জবাবদীহী করতে হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার আর মন্দ কাজের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সন্তানদেরকে খারাপ, বখাটে, নেশাকারী, চরিত্র হীন, উশৃংখল বন্ধু-বান্ধবের সংগে না মিশে ভালো ও আদর্শবান বন্ধু-বান্ধবের সাথে মেশার সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। এই বিষয়ে পরামর্শ দিন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির পর বন্ধ-বান্ধবের সাথে আড্ডা না দিয়ে যথাশীঘ্র বাসায় ফেরত এসে নিজের লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিতে হবে। আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করলে সেই সময় আর ফিরত আসবে না। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। যাতে পরে আফসোস করতে না হয়।

বাসার সাপ্তাহিক দারসের বৈঠক শেষে সপ্তাহের অন্যান্য দিনে যাতে কুরআনের কিছু আয়াত ও নির্বাচিত কিছু হাদীস মুখস্ত করতে পারে। তার জন্য রুটিন তৈরি করতে হবে। তাদেরকে এই কাজের লাভ জানিয়ে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।

কয়েকটি হাদীস দেখুন–

১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তান স্ব-স্ব স্থান হতে এক বিন্দুও নড়তে পারবে না ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত। (১) তোমার জীবন কীভাবে অতিক্রম করেছে (২) তোমার যৌবনকাল কী কাজে নিয়োজিত রেখেছো (৩) তোমার ধনসম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছ (৪) কীভাবে তোমার ধনসম্পদ ব্যয় করেছ এবং (৫) তোমার অর্জিত জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ী কতটুকুন আমল করেছ। (তিরমিজি)

২। ইবনে আমর ইবনে মাইমুন রা: হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের জীবনে ৫টি বিষয়ের গুরুত্ব দিবে। (১) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের (২) রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে সুস্থতাকে (৩) দরিদ্র হওয়ার আগে স্বচ্ছলতাকে (৪) ব্যস্ত হওয়া আগে অবসর সময়কে (৫) মৃত্যু আসার আগে জীবিত কালকে।" (তিরমিজি)

৩। আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত। রাসুল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোক আল্লাহ তায়ালার আরশের নিচে স্থান পাবে। তারা হলো: (১) ন্যায় পরায়ন শাসক (যারা মানুষের প্রতি ন্যায়

বিচার করেছে) (২) যে যুবক তার যৌবন কালকে আল্লাহর ইবাদতে কাজে লাগিয়েছে (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে লটকে থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর আরেক ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে আদায়ের প্রতীক্ষায় থাকে (৪) যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণে গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে চোখের পানি ফেলে ক্রন্দণ করে। (৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী রমণীর যেনার আহ্বানে সাড়া দেয়না (৭) যে ব্যক্তি এত গোপনে অভাবী লোকদেরকে দান করে, যে তার বাম হাত টের পায়না যে তার ডান হাত কী দান করল। (বুখারী-মুসলিম)

৪। আবু হুরাইরা রা: হতে বর্নিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, "বনী আদম যখন মারা যায় তখন তার সমস্ত আমলসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব (প্রতিদান) জারী থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া। যেমন, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখান, কুরআনের হিফজ খানা, বৃদ্ধাশ্রম, পানির কল স্থপন করে যাওয়া (২) এমন ইলম শিক্ষা দেওয়া যা তার মৃত্যুর পরও জারী থাকে। যেমন, দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, দ্বীনি বই-পুস্ত লিখে যাওয়া যা পড়ে মানুষ দ্বীন ইসলামের উপর আমল করে জান্নাতি হতে পারে (৩) এমন নেক সন্তান, যে সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে বলে, রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী ছগীরা।

এ যাবৎ সন্তানদেরকে যা কিছু শিখানো হয়েছে মাঝে-মধ্যে তা পুরাবৃত্তি করার চেষ্টা করুন। সন্তানদের সাথে পিতামাতার ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করুন।

পিতামাতা সন্তানের আদর্শ শিক্ষক। সে আদর্শ শিক্ষক সন্তানদেরকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় কুরআন ও হাদীসের আলোচনা কীভাবে করতে হয়, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষালয় হতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাপ্তাহিক বা মাসে জনতার সামনে আলোচনা করার অভ্যাস গড়ে তুললে ভবিষ্যতে এই সন্তান একজন ভালো আলোচক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

প্রত্যেক পিতামাতার একান্ত আশা ও তারা চায় নিজেরা জাহান্নামের আগুন হবে বাঁচবে এবং তাদের সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন হবে বাঁচাবে। এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সূরা আত তাহরীমের ৬নং আয়াতে বলেন, "হে ঈমানদাররা, তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচ এবং তোমাদের আহালকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও।" আমি ও আমার আহালকে জাহান্নাম হতে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নির্দেশিত সকল কাজ করতে হবে।

উক্ত কুরআনের আয়াতের আলোকে যে সব পিতামাতা নিজেরা জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচার চেষ্টা করে। তাদের আহালদেরকে পরিকল্পনা করে আল্লাহর নির্দেশে ও রাসূল (সা.) এর প্রদর্শিত পথে শিরক ও বিদাত মুক্ত প্রশিক্ষণে নিজেরা গঠিত হয়ে তাদের সন্তানদেরকে ঐ পথে পরিচালিত করতে তারাই উত্তম পিতামাতা।

আবার অনেক পিতামাতা সন্তান জন্মের পর নিয়ত করে, তাদের সন্তানদেরকে ৩০ পারা কুরআন মুখস্ত করিয়ে তার অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে একজন মুসলমান হিসাবে কোন কাজটি করণীয়, কোন কাজটি বর্জণীয়, কোনটি আল্লাহর হক্ব, কোনটি বান্দার হক্ব, শরিয়তে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, শয়তানের পরিচয় শিখিয়ে সৎ কাজের মাধ্যমে সন্তানদেরকে গড়ে তুলছেন সে সব পিতামাতা সফলকাম।

আল্লাহ আমাদের সকল পিতামাতা সহ প্রত্যেকটি সন্তানকে আদর্শ মুসলমান হিসাবে গড়ে উঠে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত ইসলামের খেদমত করার তৌফিক দান করুন- আমীন।

প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব সন্তান বয়োপ্রাপ্ত হলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়া সমাপ্ত করে চাকুরিতে প্রবেশের প্রারম্ভে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্যে রাসূল (সা:) তাগিদ করেছেন। তবে বিবাহের পূর্বে বিবাহের প্রশিক্ষণ কোর্স সার্টিফিকেট নেওয়া সবার জন্য আবশ্যক, যাতে করে সামান্য কারণে বিবাহ ভেঙ্গে না যায়।

৩৭. বিবাহ (اَلنِّكَاحُ)

বিবাহ কাকে বলে– কীভাবে বিবাহ বৈধ হয়ঃ

আরবি اَلنِّكَاحُ নিকাহ্ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিয়ে, শাদি, বন্ধন ও মিলন। আভিধানিক অর্থ চুক্তি করা বা সংযুক্ত করা। মানব বংশের বৃদ্ধিই বিবাহের লক্ষ্য। আর সে জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে নারী। ক্ষমতা দেয়া হয়েছে নারীকে গর্ভধারণের এবং সন্তান প্রসবের। আর যেহেতু মানুষ পশু নয়, তাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে যত্রতত্র যৌন ক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাকে বরং নিয়ম-নীতির আলোকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্মানজনক পন্থায় কাম চাহিদা পূরণ করার রীতি প্রণয়ন করেছে।

ইসলামী শরীয়তে বিবাহের প্রকৃত সংজ্ঞাঃ

পুরুষ ও মহিলার চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে বৈধ পন্থায় কুরআন-হাদীস অনুসরনে রাসূল (সা) এর দেখানো পদ্ধতিতে সামর্থ অনুযায়ী কিছু মোহরানা ধার্য্য করে মেয়ের পিতা (যদি পিতা না থাকে তার অবর্তমানে) নিকটতম অভিভাবকের অনুমতিতে মেয়ের সম্মতি নিয়ে দুই জন সাক্ষীর সামনে একে অপরকে জীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়াকে **বিবাহ** বলে।

শারীরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সামর্থ থাকা ব্যাক্তির উপর বিবাহ একটি সামাজিক ফরয ইবাদত (আবার অনেকের মতে বিবাহ রাসূল (সা.) এর একটি সুন্নাত)। বিবাহে বিলম্ব করা ব্যক্তি যে কোনো মুহূর্তে গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পারে। তাই সামর্থবান ব্যক্তিকে বিয়ে করে পাপের পথ হতে বেঁচে থাকতে হবে।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি ৫টি :

১। দ্বীনদার ও চরিত্রবান
২। বংশ আভিজাত্য
৩। সুশ্রী ও সৌন্দর্য্য
৪। ধন সম্পদ
৫। শিক্ষা

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ৫টি মাপকাঠি পাওয়া গেলে ধার্মিক পরিবার আল্লাহভীরু, দ্বীনদার, নামাজ, রোজা ইত্যাদি ইসলামী নৈতিকতা আমলিয়াত পাওয়া গেলে বিলম্ব না করে সন্তানাদিকে বিয়ে দিয়ে দেয়া মাতা-পিতার একান্ত কর্তব্য। সন্তান লালন পালনকালে মাতা-পিতা সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ ও আমলিয়াত নিয়ে সন্তান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। চাকরী, ব্যবসা করে নিজস্ব সংসার গড়ে তুলবে। মাতা-পিতার বৃদ্ধ অবস্থায় তাদের সেবা যত্ন করা সন্তানদের কর্তব্য এবং তাদের জন্য দোয়া করা।

বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণসমূহ :

১। একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা ও মান্য না করা।

২। ধৈর্য ধারণ না করে হঠাৎ রেগে যাওয়া।

৩। সুন্দর আচরণ ও ক্ষমা করার মন-মানসিকতা না থাকা।

৪। যে কোন কারণে মনের অমিল হলে– দীর্ঘ দিন কথা বন্ধ করে দেওয়া।

৫। স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ না করে নিজে-নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

৬। ন্যায় বিচার করার জন্য নিজকে ছোট মনে না করা।

৭। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পারিবারিক বৈঠক ও দৈনিক কাজের পরিকল্পনা না থাকার কারণে এক অপরকে সংসারে শান্তি বৃদ্ধি করার জন্য সহযোগিতা না করা।

৮। প্রত্যেক দিন শেষে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার মুহূর্তে মনের অজান্তে ঘটে যাওয়া ভুলত্রুটির জন্য পরস্পরকে ক্ষমা করে মাফ চেয়ে নেওয়ার অভ্যাস না থাকা।

বিবাহ যাতে না ভাঙ্গে তার সমাধান :

১। বিয়ের আগে স্বামী স্ত্রীর কি করণীয় ও বর্জনীয় সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রশিক্ষণ নেয়া।

২। বিয়ের মোহরানা সমর্থ অনুযায়ী ধার্য্য করা।

৩। ক্ষমাশীল হয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।

৪। স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

৫। পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি করা ও নিজের মতের উপর অপরের মতের প্রাধান্য দেয়া।

৬। প্রত্যেক কার্জে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

৭। পারিবারিক সকল কাজ স্বামী-স্ত্রীর মিলেমিশে পরামর্শক্রমে চললে সে সংসারে সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবে।

৮। সাপ্তাহিক, মাসিক পারিবারিক বৈঠক ও দৈনিন্দিন পরিকল্পনা করে একে অপরকে বাস্তবায়নের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে।

৯। স্বামী-স্ত্রীর মনের অমিলে কথা কাটাকাটি হলে রাগ করে কথা বন্ধ করা যাবে না।

১০। রাগ দমনে যিনি সালাম দিয়ে আগে কথা বলবেন, তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট অনেক বেশি ও তিনি শ্রেষ্ঠ।

১১। বংশ মর্যাদা ও মাতা-পিতার বড়ত্ব ও ধন সম্পদের গর্ব অহংকার পরিত্যাগ করতে হবে।

১২। নিজেদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩। দিনের শেষে ঘুমে যাওয়ার আগে নিজেদের ভুলের জন্য একে অপরকে মাফ করে দিতে হবে।

১৪। পরিবারে সুখ শান্তির জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। নিয়মিত কুরআন হাদীস এবং গভীর রাতে তাহাজ্জূত নামাজ পড়ার অভ্যাস করতে হবে।

৩৮. পিতা-মাতার অধিকার (حُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার ওসিলায় দুনিয়াতে সন্তানের আগমন। সন্তান জন্মাবার বহু আগ থেকেই মাতা পিতা সন্তানের কল্যাণের জন্যে নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট আনন্দের সাথে বরণ করে নেয়। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবদান কখনও ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এ জন্যই সন্তানের কাছে পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশি। আল্লাহর হক তথা ইবাদাত বন্দেগির পরেই পিতা-মাতার হক আদায়ের গুরুত্ব মহান আল্লাহ তার পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহকে খুশি করার জন্য পিতা-মাতাকে আমাদের ব্যবহার এবং কার্যাবলি দ্বারা খুশি করতে হবে। তাদের প্রতি অনুগত থাকা আল্লাহরই নির্দেশ। পিতা-মাতা আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। ছোটকালে যারা পিতা-মাতা হারান তারাই বুঝতে পারেন, পিতা-মাতা কত বড় নিয়ামত। পৃথিবীর সব ধর্মই নির্দেশ করে পিতা-মাতাকে মান্য করতে হবে। সুতরাং একজন মুমিন হিসেবে পিতা-মাতার যথাযথ সেবা করা ফরয। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া মানেই কবিরা গুনাহ।

পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরীক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ করো।" (সূরা নিসাঃ ৩৬)

পিতা-মাতার অধিকার

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সম্পর্কে আদেশ করেছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভধারণ করেছেন। দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করেছেন। তোমরা আমার এবং তোমাদের পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সূরা লুকমান : ১৪)

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।" (সূরা ইবরাহীম ও ৪১)।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ○

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও আমার গৃহে মু'মিনরূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল মুমিন নর-নারীকে ক্ষমা করো।" (সূরা নূহ ঃ ২৮)

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

"হে আল্লাহ! আমার পিতামাতার প্রতি সে রকম অনুগ্রহ কর, যে রকম অনুগ্রহ করে তারা আমার ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৪)।

পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে কুরআনের আরো কিছু আয়াতের টিকা- ১৭-সূরা বনি ঈসরাইল- ২৩, ২৪, ৪৬ আহকাফ-১৫, ২৯- আনকাবুত-৮, ২-সূরা বাকারা- ২১৫, ১৪-ইব্রাহিম- ৪১, ১৭-সূরা নূহ-২৮।

পিতা মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদীস

পিতামাতা হচ্ছে সন্তানের বেহেশত ও দোযখ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক আছে? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও তারা তোমরা দোযখ।" (ইবনে মাজা ৩য় খণ্ড, অধ্যায় শিষ্টাচার পৃঃ নং- ৩৪১)।

মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়

আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মাতা-পিতার অবাধ্যতা ছাড়া অন্য যে সকল গুনাহ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে থেকে অনেক গুনাহই আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যকে আল্লাহ মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে ছাড়েন।" (বায়হাকী)।

৩৯. সবর বা ধৈর্য (اَلصَبْرُ)

সবর পরিচিতি

اَلصَبْرُ (সবর) শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবি শব্দ। যার অর্থ কোন একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ধৈর্যধারণ করা, সহজ করা, বিরত থাকা, বাধা দেয়া, বেঁধে রাখা, অটল, অবিচল থাকা অধ্যবসায় ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'সবর' অর্থ- সর্বপ্রকার বিপদ-আপদে বা পার্থিব কোন বালা-মুসিবতে, কিংবা কোন অন্যায়-অত্যাচার, দুঃখ-কষ্টে, রোগে-শোকে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়, ইবাদতে, যুদ্ধ-জিহাদে বিচলিত না হয়ে এবং মেজাজের ভারসাম্য না হারিয়ে, আনন্দে ও সুখে আত্মভোলা না হয়ে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে সবকিছু সহ্য করে অটল-অবিচল থাকাকেই সবর বা ধৈর্য বলা হয়। যে ব্যক্তি এ মহান গুণে গুণান্বিত তাকে (صَابِر) সাবের বা ধৈর্যশীল বলা হয়।

ধৈর্যধারণ করতে আল্লাহর নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল বাকারা : ১৫৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

"ওহে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যাও। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ২০০)

اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۝

"তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি নির্ভরশীল।" (সূরা সাদ : ১৭)

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۝

"তারা যা কিছু বলে, তার জন্যে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" (সূর আল কাফ : ৩৯)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ

"হে নবী! আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল।" (সূরা আল কলম : ৪৮)

বিপদে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ۝

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব- কিছুটা ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসলের বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পড়ে, তখন বলে : নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই কাছে ফিরে যাব।" (সূরা আল বাকারা : ১৫৫-১৫৬)।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ۝

"অতপর সে (ইসমাঈল) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহীম (আ.) তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী? সে বলল : পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুণ। আল্লাহ চাহেতো আপনি অবশ্যই আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" (সূরা আস সাফফাত : ১০২)।

সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, সবরকারী ছাড়া

وَ الْعَصْرِ ۝١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

"সময়ের কসম, নিশ্চয়ই সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের তাকিদ করে ও পরস্পর পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।" (সূরা আল আছর)।

আল্লাহই সবচেয়ে বড় সবরকারী

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।

সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে কুরআনের আরো কিছু আয়াতের টীকা দেখুন–

সূরা মায়ারিজ- ৫, সূরা ইউনুছ ১০৯, সূরা হুদ- ৪৯,১১৫, সূরা-নাহল- ১২৭, সূরা-আহকাফ- ৩৫, সূরা-আনয়াম- ৩৪।

সবর বা ধৈর্য সম্পর্কে হাদীস

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি প্রদান করবেন। আর ধৈর্য হতে অধিক উত্তম ও ব্যাপক কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)

৪০. اَلتَّوْبَةُ তাওবা

তাওবা পরিচিতি :

তাওবা اَلتَّوْبَةُ শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় কোন অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ হয়ে যাবার পর অনুতপ্ত হয়ে সেই কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে মাফ বা ক্ষমা চাওয়া এবং সেই অন্যায় কাজ ছেড়ে ভালো কাজে ফিরে আসাকেই তাওবা বলা হয়।

ওলামায়ে কিরামের মতে, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোনো লোকের হক জড়িত না থাকে, তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে।

প্রথমত ঃ তাওবাকারীকে গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে

দ্বিতীয়ত ঃ সে তার কৃত গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয়ত ঃ তাকে পুনরায় গুনাহ না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে গুনাহের কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে, ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা থেকে তাওবা করার উপরের তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে, যা বান্দার হকের সাথে জড়িত।

তাওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পদের হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে, তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। কোনো অন্যায় দোষারোপ এবং অন্য কোন বিষয় থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে।

আদম (আঃ) এর তাওবা :

فَتَلَقَّىٰ اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

"অতপর আদম তার রবের কাছে কতগুলো (তাওবা করার) কথা শিখে নিলেন এবং তাওবা করলেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।" (সূরা বাকারা : ৩৭)

নিজের উপর জুলুম করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন–

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"অতপর যে নিজের অত্যাচরের পর তাওবা করে এবং সংশোধন হয়। তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।" (সূরা মায়িদা : ৩৯)

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে। তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদিগার তাওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী করুণাময়।" (সূরা আল-আরাফ : ১৫৩)

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

"তিনি (আল্লাহ) তার বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। পাপসমূহ মার্জনা করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন।" (সূরা আশ-শূরা : ৫)

তাওবা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের টীকা :

সূরা আল-ফুরকান: ৭০,৭১, বুরুজ: ১০, আত-তাহরীম: ৮, আন-নিসা: ১৭, মায়েদা: ৭৪।

তাওবা সম্পর্কে হাদীস

কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুল হবে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَّغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ .

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে (অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে) তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন।" (মুসলিম ৭ম খণ্ড অধ্যায় যিকর দোয়া ও ইসতিগফার পৃ: ২০৭)

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাওব কবুল হবে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (সা.) বলেছেন, "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন।" (তিরমিযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, অধ্যায় দোয়া, পৃ: ১৯৩)

রাসূল (সা.) দিনে সত্তর বারেরও বেশি তাওবা করতেন–

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ فِی الْیَوْمِ اَکْثَرُ مِنْ سَبْعِیْنَ مَرَّةً

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর শপথ! আমি একদিনে সত্তর বারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ চাই।" (সহীহ বুখারী ৯ম খন্ড, অধ্যায় দু'আ, পৃ: ৫৫৩)

দোয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত

দোয়া কাকে বলে? আমরা কেনো কি ভাবে দোয়া করব?

দোয়ার আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা করা, চাওয়া, ডাকা, ইত্যাদি। আল্লাহর নিকট ভালো কিছু পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করা বা আবেদন-নিবেদন করা। আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ

"হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা: ২: ১৫৩)

দোয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।"

নোমান বিন বশির থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

"দোয়া হচ্ছে ইবাদত।" (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজা)

এখানে দোয়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো-

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "কোনো মুসলমান যদি এমন দোয়া করে যাতে কোনো গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার আহবান না থাকে; তাহলে আল্লাহপাক তাকে তিনটির যে কোনো একটি বিনিময় দান করেন-

১. হয় সাথে সাথে তার দোয়া কবুল করেন,

২. না হয়, আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রাখেন,

৩. এ পরিমাণ ক্ষতিকর কিছু থেকে তাকে হেফাজত করেন।

তখন সাহাবারা (রা.) বলল, তাহলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করবো। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ সবচেয়ে অধিক দাতা। (তিরমিজি)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "দোয়া মুমিনের হাতিয়ার। দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান ও জমিনের আলো।"- বায়হাকী হাকেম।

আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে বিপদ পতিত হয়েছে বা এখনো পতিত হয়নি তার জন্য দোয়া উপকারী। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের দোয়া করা জরুরি।" -বায়হাকী হাকেম

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "সবচেয়ে দ্রুত যে দোয়া কবুল হয় তা হচ্ছে- কোনো ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করা।" আবু দাউদ ও তিরমিজি।

অন্য এক হাদিসে আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন "কোনো মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। তার মাথার কাছে নিয়োজিত ফেরেশতা আমিন বলেন এবং বলেন, তোমার জন্য ও অনুরূপ হোক।" -মুসলিম

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ (সা.) বলেন, "তিন ব্যক্তির দোয়া বিনা পর্দায় কবুল হয় এতে কোনো সন্দেহ নেই- ১. মাতা-পিতার দোয়া, ২. মজলুমের (অত্যাচারিতের) দোয়া এবং ৩. মুসাফিরের দোয়া।" -আবু দাউদ ও তিরমিজি।

সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ চিরঞ্জীব ও সম্মানিত, কোনো বান্দা তার কাছে দুহাত তুললে, তিনি খালি হাতে তাকে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।" -তিরমিজি ও আবু দাউদ

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে নিজ প্রয়োজন পূরণের জন্য দোয়া করা উচিত। এমন কি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। -তিরমিজি।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, "যে আল্লাহর নিকট কিছু চায়না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার ওপর রাগ করেন।" -তিরমিজি।

দোয়া ও মোনাজাতের মধ্যে পার্থক্য কী?

الدعاء والمنجات দোয়া ও মোনাজাত, এ দুটি শব্দের মধ্যে ব্যবহারগত দিক থেকে তেমন পার্থক্য নেই। কিন্তু শাব্দিক দিক থেকে পার্থক্য আছে। কুরআনে কারিমের মধ্যে মূলত যে শব্দটি এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে দোয়া। এই দোয়াকে খুব সহজে বোঝানোর জন্য উর্দু ভাষায় মোনাজাত ব্যবহার করা হয়। মোনাজাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কানে কানে কথা বলা, চুপিচুপি কথা বলা এবং এই কানে কানে কথা বলাটা দুজনের মধ্যে হতে হবে। তাই মোনাজাতের মধ্যে অংশগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার। বান্দা গোপনে বা চুপিচুপি অথবা কানে কানে যে কথা বলবে, সেটি মোনাজাত হবে। আমাদের দেশে সম্মিলিত ভাবে উচ্চ স্বরে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা করা হয়, তা আসলে মুনাজাত নয়-তা হল দোয়া। দোয়া এবং মুনাজাতের অর্থগত পার্থক্য যাই হোক না কেন আমরা এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করি। মোট কথা আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। তাই আমাদেরকে আল্লাহর নিকট দোয়া এবং মুনাজাতের মাধ্যমে আমাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন, চাওয়া-পাওয়া, তওবা করা ইত্যাদির জন্য দোয়া এবং মোনাজাত করতে হবে।

৪১. মাসনূন দোয়াসমূহ

১। ঘুমাবার সময়

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যু বরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন ধারণ করি।"

২। ঘুম হইতে জেগে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهَ النُّشُوْرُ.

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন। আর (এইভাবে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

৩। খাবার সামনে আসলে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ! আমাদের রুজিতে বরকত দিন এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি হতে বাঁচান।"

৪। খাবার শুরুতে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ.

"আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকত চেয়ে (শুরু করলাম)।"

৫। খাবার শেষে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقٰنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।"

৬। ঘরে প্রবেশের দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا.

" হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করি।"

৭। ঘর হতে বের হতে

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

"আল্লাহর নামে রওয়ানা করেছি, আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি সামর্থ নাই।"

৮। ভয়ের সময়

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ভাবে কার্য সম্পাদনকারী। আর তিনিই উত্তম মাওলা ও উত্তম সাহায্যকারী।"

৯। পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

"হে রব! আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহম করুন! যেমনিভাবে তাঁরা ছোট বেলায় (অনুগ্রহ করে) আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ঈসরাঈল-২৩)

১০। পায়খানায় (টয়লেটে) যাবার সময়

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"আয় আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাইছি নাপাকী ও অনিষ্টকারী শয়তান হতে।"

১১। পায়খানা হতে বের হবার সময় ডান পা আগে দিয়ে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذٰى وَعَافَانِيْ

"সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তুকে আমার নিকট হতে দূরীভূত করেছেন এবং আমাকে সুখ দান করেছেন।"

১২। মসজিদে প্রবেশ করবার সময়

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার দয়ার সমস্ত দরজা খুলে দিন।"

১৩। মসজিদ হতে বের হওয়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَالُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।"

১৪। হাঁচি দিলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

"সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য।"

১৫। হাঁচির উত্তরে

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

১৬। হাঁচিদাতা তদুত্তরে বলবে

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

"আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের পরিণাম মঙ্গলময় করুন।"

১৭। ইঞ্জিন যুক্ত গাড়ি, বাস, বিমানে উঠার দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

"প্রশংসা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রব এর নিকট প্রত্যাবর্তন করব।"

১৮। নৌকা বা সাঁকোতে উঠবার দোয়া।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۝

"আল্লাহরই নামে এর চলা ও থামা; নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

১৯। কোনো বৈঠক শেষ করে এই দোয়া

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ۝

"হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে- আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।"

২০। সহবাসের পূর্বক্ষণে নিম্নের দোয়া পড়িতে হয়

হাদিস শরীফে আছে, যেই ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে সহবাস করবে, সেই সহবাসে সন্তান জন্মিলে তাকে শয়তান কোনো দিন অনিষ্ট করতে পারবেনা।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ۝ (حصن عن ابن عباس)

"আল্লাহ তায়ালার নামে, আয় আল্লাহ আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে সরিয়ে রাখুন। এবং আমাদেরকে অদৃষ্টে যা প্রদান করেছেন, তা হতে শয়তানকে দূরে হটিয়ে দিন।"

৪২. রাব্বানা দিয়ে কতিপয় দোয়া

১.

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখিরাতেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" (বাকারাহ: ২০১)

২.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

"হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নিজ সত্তার উপর জুলম করেছি। এখন আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন! দয়া না করেন! তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংশ হয়ে যাবো।" (সূরা আরাফ : ২৩)

৩.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! হেদায়ত দান করার পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না। আর তোমার ভাণ্ডার থেকে আমাদেরকে রহমত প্রদান করো! নিশ্চয় তুমি মহানদাতা।" (সূরা আল ইমরান : ৮)।

৪.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (বাকারাহ : ১২৭)

৫.

(يَقُوْلُوْنَ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো। যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর। আর আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য নেতা।" (সূরা ফুরকান : ৭৪)

৬.

(قَالُوْا) رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"হে আমাদের প্রভু! আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়তা অবতীর্ণ করো। আমাদের পদগুলোকে সুদৃঢ় রেখো। অবিশ্বাসীদের উপরে আমাদেরকে বিজয়ী করো।" (সূরা বাকারাহ : ২০৫)

৭.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

"হে আমাদের প্রভু! শেষ বিচারের দিন আমাকে ক্ষমা করো। আর আমার মাতা-পিতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করো।" (সূরা ইবরাহীম : ৪০)

৮.

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি! অতএব আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আল ইমরান : ১৬)

৯.

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"হে আমাদের রব! আমাদের গুনাহ মাফ করো। আমাদের কাজে কোনো বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তাও ক্ষমা করো। আমাদের কদমকে মজবুত করো। আর কাফেরদের উপর বিজয় দান করো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৭)

১০.

সন্তান সন্তুতিকে নামাজি বানানোর দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

"হে আমার মুনীব! আমাকে, আমার সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানাও। হে পরোয়ারদেগার, আমার দোয়া কবুল করো।" (সূরা ইবরাহীম: ৪০)

১১.

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

"হে পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (সূরা ত্বাহা ঃ ১১৪)

১২.

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝

"হে প্রতিপালক! আমার বক্ষকে খুলে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং জবানের জড়তা দূর করে দাও- যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮)

১৩.

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা মুমেনুন : ১১৮)

১৪.

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও দয়া করো। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা মুমেনুন : ১০৯)

১৫.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا - وَارْحَمْنَا - اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুল করে থাকি বা ছোটখাট ত্রুটি করে থাকি; তাহলে তুমি সেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করোনা। আমাদের উপর সেই রূপ কঠিন বোঝা (পরীক্ষা বা আযাব) চাপিয়ে দিয়োনা; যেরূপ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছো আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। আর আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা করো। অপরাধ ক্ষমা করো। আমাদের উপর রহম করো। তুমি আমাদের প্রভু। অতএব আমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করো।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

৪৩. আল্লাহুম্মা (اَللّٰهُمَّ) দিয়ে কতিপয় দোয়া

১.

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى .

"হে রাজাধিরাজ আল্লাহ! তুমি ক্ষমার বিনম্র আধার, তুমি ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব আমায় তুমি ক্ষমা কর।" (আল বায়ান)

২.

জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ .

"হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করছি! দোযখ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ - ২/৩২৮)

৩.

জান্নাতুল ফিরদাউস পাওয়ার জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَالُكَ الْجَنَّةَ اَلْفِرْدَوْسَ

"হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করছি।" (সহীহ আল বুখারী)

৪.

কুফরি, অভাব ও কবরের আযাব থেকে মুক্তির দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ يْنَ وَالْفَقْرِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ .

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরি থেকে, অভাব-অনটন এবং কবরের আযাব থেকে।

৫.

হারাম থেকে বাঁচা, হালাল রিযিক লাভ ও ঋণ পরিশোধের দোয়া :

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ. وَاَغْنِنِيّ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচায়ে তোমার হালাল রিযিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও! তুমি ছাড়া যেনো আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়।" (তিরমিযী ৫/৫৬০)।

৬.

মৃত্যু যন্ত্রনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَعْنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

"হে আল্লাহ! মৃত্যুর ভয়াবহতা ও তার মারাত্মক কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর"।

৭.

হেদায়েত লাভের দোয়া,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَالُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট হেদায়েত, পরহেযগারিতা, ক্ষমা ও পর মুখাপেক্ষিহীনতার জন্য প্রার্থনা করছি।"

৮.

আয়নায় মুখ দেখে দোয়া,

اَللّٰهُمَّ حَسَنَتَ خَلْقِیْ فَحَسِنْ خُلُقِیْ وَحَرِّمَ وَجْهِیْ عَلَی النَّارِ

"হে আল্লাহ! তুমি আমার চেহারা সুন্দর করেছ। কাজেই আমার স্বভাব-চরিত্রকে সুন্দর করে দাও। আমার চেহারাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দাও।"

৯.

বার্ধক্যজনিত কষ্টের মাধ্যমে মৃত্যু থেকে পানাহ চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ

"হে আল্লাহ! তোমার নিকট বার্ধক্যজনিত কষ্ট হতে পানাহ চাই।"

১০.

গুনাহ মাফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَّجُلَّهٗ وَّاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِیَّتَهٗ وَسِرَّهٗ

"হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, ছোটগুনাহ, বড় গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহ।" (মুসলিম শরীফ)

১১.

দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَرْحَمْنِیْ وَاَهْدِنِیْ وَعَافِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَارْفَعْنِیْ.

"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমার উপর রহম করো, আমাকে হেদায়াত দান করো, আমাকে সুস্থ রাখো! আমাকে রিযিক দান করো ও আমাকে উন্নত করো।"

১২.

ফরজ নামাযের সালাম ফিরাবার পর পঠিতব্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

"হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি। তোমার পক্ষ থেকেই শান্তি! তুমি বরকতময় ও মহান।"

১৩.

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ؟

"হে আল্লাহ আমাকে তোমার যিকির করার, তোমার শোকর আদায় করার এবং ভালোভাবে তোমার ইবাদত করার তাওফীক দাও।" (আবু দাউদ, নাসাঈ)

১৪.

হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চেয়ে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مَوْتِ الْفَجَأَةِ .

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হঠাৎ মৃত্যু থেকে পানাহ চাই।"

১৫.

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছিলাম। এখন আপনার প্রদত্ত জীবিকা দ্বারাই ইফতার করছি।"

১৬.

ইফতারের পরের শোকর আদায়ের দোয়া-

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَالَتِ الْعُرُوْقِ وَثَبَتِ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

"পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীগুলি সিক্ত হয়েছে, সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশাআল্লাহ।"

১৭.

আযান শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আপনিও বলুন

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَاجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ.

"হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু! মুহাম্মদ (সা.) কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম মর্যাদা দান করো। আর তাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দাও। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছে।" (নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না)

১৮.

উত্তম আখলাকের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ-

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চরিত্র, আমল ও প্রবৃত্তির অন্যায় সমূহ থেকে।"

৪৪. ফরজ নামাযে সালাম ফিরাবার পর কতিপয় দোয়া ও আযকার

১.

মিজানের পাল্লাকে ঝুকিয়ে দেয়ার দোয়া

(১) سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(১) অর্থ: আল্লাহ পবিত্রতম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ সুমহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সর্বোচ্চ ও সুমহান আল্লাহ ব্যাতীত কেহ ক্ষমতাবান নেই। এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ নির্ভর যোগ্য নয়।

(২) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

(২) অর্থ: আল্লাহ পবিত্রতম, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই, সুমহান আল্লাহই পবিত্রতম।

(৩) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ

(৩) অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

২.

রুকু ও সিজদায় তাসবীহের শেষে রাসূল (সা.) আরও পড়তেন

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ سُبُّوحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ

"হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ করছি। হে পাক পবিত্র এবং ফেরেশতা ও জিবরাইলের রব, আমাকে মাফ করো।"

৩.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ وَعَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَى نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

আল্লাহর প্রশংসা সহকারে সহবীহ পাঠ করছি তার সৃষ্টির সংখ্যার পরিমাণ, তিনি যত পছন্দ করেন সে পরিমাণ, আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁর কালাম লেখার কালির পরিমাণ।

৪.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

"আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ করছি। আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি ও তাঁর নিকট তাওবা করছি।"

৫.

حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

"আমি তোমার উপর ভরসা করছি, তুমি ছাড়া মা'বুদ নাই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করছি। আর তিনিই সুমহান আরশের রব।" (সূরা তাওবা : ১২৯)

৬.

কোন দু:সংবাদ শুনলে দোয়া

اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"নিশ্চয় আমারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা বাকারা ঃ ১৫৬)

৭.

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ-

"তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এই ভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করি।" (সূরা আম্বিয়া : ৮৮)।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দান কর। সে সব লেকের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। যারা অভীশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।" (সূরা ফাতিহা: ৫-৭)

৮.

উত্তম মৃত্যুর দোয়া

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

"হে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টা! দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার বন্ধু। আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করো। নেককারদের সাথে আমাকে মিলিত করো।" (সূরা ইউসূফ ও ১০১)।

৯.

অজু শেষ করে কালিমায়ে শাহাদত পড়া

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক; তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

১০.

আরাফাত দিবসের দোয়া

রাসূল (সা.) বলেন - শ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে আরাফার দিবসের দোয়া। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম দোয়া হচ্ছে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই এই সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।"

১১.

اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"হে নবী আপনি বলুন! আমার নামাজ আমার কোরবানী আমার জীবন ও মৃত্যু সবই মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" (সূরা আন আম-১৬২)

১২.

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

"হে নফসে মুতমাইন্না (শান্তিময় আত্মা)! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চলো এই ভাবে যে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর।" (সূরা ফাজর, ২৭-৩০)।

১৩.

সাইয়েদুল ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোত্তম দোয়া,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتَ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْء بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۝

"আল্লা-হুম্মা আনতা রাব্বি-লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাকৃতানি ওয়াআনা 'আবদুকা ওয়াআনা 'আলা 'আদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতা'তু আউ-যুবিকা মিন শাররি মা সনাতু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবু-উ-বিযামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরু যুনুবা ইল্লা আনতা।"

অর্থ: "হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহা নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। আমার উপর তোমার দেয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি এবং আমার গোনাহের কথাও স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেহ নেই।"

১৪.

اَسْاَلَ اللّٰهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشَ الْعَظِيْمَ اَنْ يَّشْفِيْكَ ۝

"আমি মহান আল্লাহর কাছে চাচ্ছি, যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন আপনাকে রোগমুক্তি প্রদান করেন।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩১০৬) (সাতবার)

لَا بَاسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اَللّٰه . (بخارى)

"কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহ যদি চান তো রোগটি গুনাহ থেকে পবিত্রকারী হবে।" (সাতবার)

৪৫. বাংলায় মুনাজাত

রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের মধ্যেই দোয়া করেছেন। তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময়কাল হল নামাজের সময়কাল। নামাজের এই নিরিবিলি সময়ে বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে মুনাজাত করে। ছানা হতে সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত শুধু দোয়া আর দোয়া। অর্থ বুঝে পড়লে উক্ত দোয়াগুলোর বাইরে বান্দার আর তেমন কিছুই চাওয়ার থাকে না। মুসল্লী যতক্ষণ নামাজের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ সে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে বা মুনাজাত করে। কিন্তু যখনই সালাম ফিরায় তখনি সেই বিশেষ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন সিজদার সময় বান্দা তার সর্বাধিক প্রভুর নিকট পৌছে যায়। অতএব ঐ সময় তোমরা সাধ্যমত বেশি বেশি দোয়া করো। অন্য হাদীসে এসেছে যে তিনি শেষ বৈঠকে তাশাহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশি বেশি দোয়া করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরয নামাজের পরে অনেক তাসবিহ পড়ে সময় নিয়ে একাকী দোয়া করেছেন। সাহাবীগণও রাসূলূ (সা.) এর অনুসরণ করে দোয়া করতেন। আজ মক্কা-মদীনায় কোনো মসজিদে ফরয নামাজের পর ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে মুসল্লিদেরকে নিয়ে হাত তুলে যৌথভাবে মুনাজাত করা হয় না। এমনকি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হজ্জের সময়ও হাত তুলে মোনাজাত করা হয়না। আমাদের মক্কা-মদিনার নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত করার পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এককভাবে দোয়া মুনাজাত করার কিছু পদ্ধতি :

আরবীতে যে দোয়াগুলো আপনার মুখস্ত আছে– তা পড়ুন। তারপর বাংলায় আপনার মনের ভাষায় দোয়া করতে পারেন। আল্লাহকে আপনার মনের কথা বলুন–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো।"

হে আল্লাহ, আমি গুনাহগার বান্দা, তুমি আমার জীবনের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, দৈনিক ব্যস্ততার মাঝে কাজের ফাঁকের সময়টিকে যেন তোমার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সর্বদা নিজের জিহ্বাকে যিকিরে নিয়োজিত রাখতে পারি (মৃত্যু আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত) আমাকে সেই তৌফিক দান করুন। এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়। আমি কি আমল নিয়ে কবরে যাবো এই চিন্তা যেন মনে জাগ্রত থাকে- আল্লাহ আমাকে সে তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ, যখনই আমার মৃত্যু আসে তখন তোমার সন্তুষ্টি ও ঈমানের হালতে শাহাদাতের মৃত্যু দিও। হঠাৎ মৃত্যু হতে রক্ষা করিও। হে আল্লাহ, হক ও হালাল রুজির ভিতরে থেকে যেন জীবন ধারণ করতে পারি আমাকে সেই তৌফিক দান করুন। হারাম ইনকাম ও হারাম খাওয়া হতে যেন বিরত থাকতে পারি এবং কুরআনের আইন অনুযায়ী পর্দা পালন ও রাসূলের তরিকায় জীবন পরিচালনা করতে পারি; আমাকে সেই তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ,

একাগ্রতা সহকারে ধীরস্থির ভাবে রুকু, সিজদাসহ যেন প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি। আর গর্ব অহংকার, হিংসা, গীবত- পরনিন্দা ও মুনাফিকী, মিথ্যাসহ সকল খারাপ হতে নিজেকে দূরে রাখতে পারি। আমাকে সেই তৌফিক দান করো। আমার জন্য যা ভাল তা তুমি দান করো এবং যা খারাপ তা হতে মুক্ত রাখিও।

হে আল্লাহ, গরীব, এতিম, অসহায়, মজলুম, অসুস্থ্য ও নিরীহ মানুষের সাহায্য ও সেবা যেন করতে পারি, সে তৌফিক দান করুন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারভুক্ত লোকদেরকে ইসলামের পথে চলার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সময়কে মূল্য দিয়ে রুটিন মোতাবেক কুরআন ও হাদীসের তারবিয়্যাহ যেন দিতে পারি ও সর্ব সময় অজু অবস্থায় থাকতে পারি আমাকে সেই তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ দিনের প্রারম্ভে সকাল বেলায় কাজে যাওয়ার আগে ভালো-ভালো আমল করার পরিকল্পনা করে তা যেন বাস্তবায়ন করতে পারি। আমাকে সেই তৌফিক দান করিও এবং ইবাদতরত অবস্থায় মৃত্যু দিও। যেমন নামাজরত অবস্থায়/রোযা অবস্থায়/কালেমা পাঠরত অবস্থায়। সর্ব অবস্থায় জিহ্বাকে তোমার স্মরণে ভিজা রেখে দোয়া যেন পড়তে পারি সেই তৌফিক দিও।

(১) সুবহানাল্লাহী অবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

(২) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকাল হুদা অত্তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা–

(৩) আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা জান্নাতাল ফেরদাউস ওয়া আউযুবিকা মিনান্নার।

দিনের শেষে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে মাফ করে দেওয়ার মাধ্যমে ঘুমের দোয়া, সাইয়েদুল ইস্তেগফার ও আয়াতুল কুরছি পড়ে ঘুমাতে পারি আমাকে সেই তৌফিক দান করিও! আমীন।

সমাপ্ত